দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

ভারতকেশরী ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনই হলো বাঙ্গালির আশু কর্তব্য— পৃঃ ১১

বঙ্গবিভাগ থেকে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম

হিন্দু বাঙ্গালির পরিত্রাতা ড: শ্যামাপ্রসাদ — পৃঃ ১৪

৭৮ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা।। ৬ জুলাই, ২০২৬।। ২১ আষাঢ়, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্মরণে

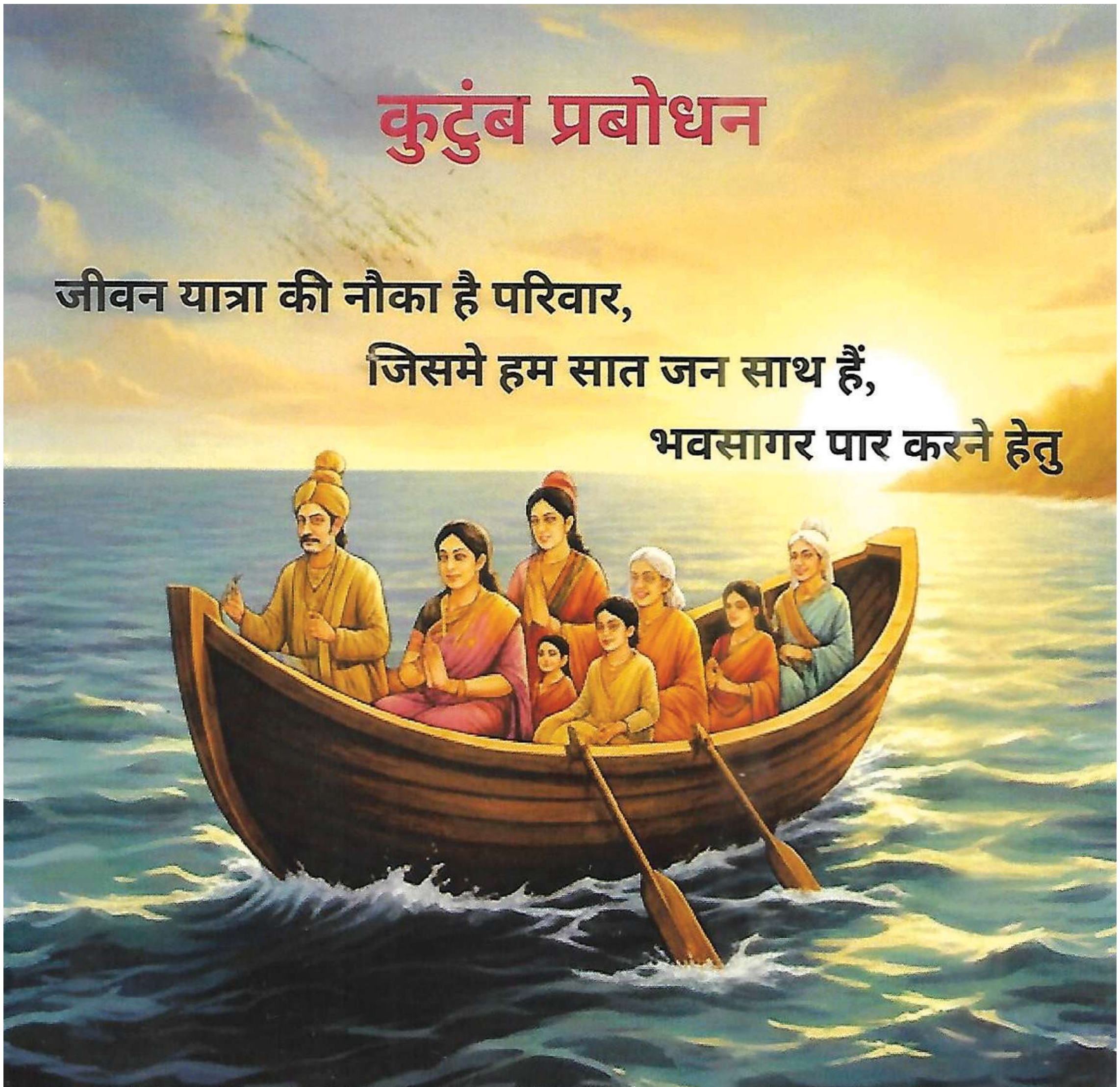

लक्ष्य

संयुक्त परिवार	संगठित, सशक्त, सुरक्षित परिवार
स्वस्थ परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
सुसंस्कृत परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
आदर्श परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা

৭৮ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা, ২১ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

৬ জুলাই - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

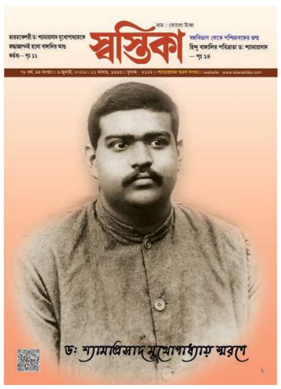

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

অপ্রাসঙ্গিক হিন্দু বিরোধিতার তোয়াক্কা না করে 'হিন্দু হোমল্যান্ড' প্রতিষ্ঠাই এখন লক্ষ্য : বঙ্গভূমি ত্বয়া হিন্দুভূমে

◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

শ্যামাপ্রসাদ শুধু বঙ্গ নয়, বাংলা বানানেরও রক্ষক

◻ পিনাকপাণি ঘোষ ◻ ৭

আলোর দিশারি ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

◻ কল্যাণভঞ্জ চৌধুরী ◻ ৮

ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : এক সাংস্কৃতিক সংস্করণ

◻ ড: প্রিয়া সিনহা ◻ ১০

ভারতকেশরী ড: শ্যামাপ্রসাদকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনই হলো বাঙ্গালির আশু কর্তব্য ◻ ডা: মধুসূদন পাল ◻ ১১

বঙ্গবিভাগ থেকে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম : হিন্দু বাঙ্গালির পরিত্রাতা শ্যামাপ্রসাদ ◻ ড: প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায় ◻ ১৪

ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির শিক্ষাদর্শন বিকশিত ভারতের ভিত্তি

◻ কিশোর বর্মণ ◻ ১৭

রবীন্দ্রনাথ—চিরনির্ভর শ্যামাপ্রসাদ ◻ অমিত দাশ ◻ ১৯

সুদূরের আলোকবর্তিকা : ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

◻ সৌমিত্র মুখোপাধ্যায় ◻ ২২

হিন্দুর নিরাপদ বাসভূমি 'পশ্চিমবঙ্গ'-এর সৃষ্টিকর্তা ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ◻ পিন্টু সান্যাল ◻ ২৩

শিক্ষাবিদ ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

◻ ড: বিভাস কান্তি মণ্ডল ◻ ২৯

পারিবারিক জীবনে ড: শ্যামাপ্রসাদ

◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩১

বাংলা পরিভাষা নির্মাণ, বানান সংস্কার এবং ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ◻ ড: বাপ্পাদিত্য মাইতি ◻ ৩৫

ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও মেদিনীপুর : রাজনীতি, জাতীয়তা এবং বঙ্গীয় সমাজ

◻ ড: শুভদীপ গঙ্গোপাধ্যায় ◻ ৩৯

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও কাশ্মীর : ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন ও আত্মবলিদান ◻ ড: তরুণকান্তি চক্রবর্তী ◻ ৪৩

ভারতীয় রাজনীতিতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

◻ সরোজ চক্রবর্তী ◻ ৪৭

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে
১৩ জুলাই
২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৩ জুলাই
২০২৬

রথযাত্রা

রথযাত্রা মূলত প্রভু জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথে করে গুণ্ডিচা মন্দিরে যাত্রা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এক প্রাচীন ভারতীয় উৎসব। এই উৎসবে শ্রীভগবান মন্দির ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসেন ভক্তদের মাঝে। ভক্ত ও ভগবানের মিলন ঘটে এই সময়।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় রথযাত্রার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০্) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫   ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে উনআশি বর্ষ পূর্ণ করতে চলেছে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693   IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শ্যামাপ্রসাদ শাশ্বত, চির অম্লান

বলা হইয়া থাকে যে, বহুকাল বাঙ্গালি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ভুলিয়া ছিল। কথাটি সত্য নহে। সত্য হইল, বহুকাল বাঙ্গালি মানস হইতে শ্যামাপ্রসাদকে লুক্কায়িত রাখা হইয়াছিল। ক্ষমতালোভী স্বার্থান্বেষী কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা এই কার্যটি সুচারুরূপে করিয়াছিল। শ্যামাপ্রসাদের বিশাল ব্যক্তিত্বের নিকট ম্লান হইবার ভয়েই তাহারা ইহা করিয়াছে। এখনোও করিয়া চলিতেছে। কংগ্রেস দলটি যে ভণ্ড দেশপ্রেমিক এবং কমিউনিস্টরা যে দেশদ্রোহী তাহা তাহাদের নানান অপকর্মের মাধ্যমে বহু পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। তাহারা দেশের মনীষী ও দেশনায়কদের প্রতি বরাবর দুর্ব্যবহার করিয়াছে। তাঁহাদের চরিত্রে কালিমা লেপন করিয়াছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি কংগ্রেসের বিরূপ ব্যবহার এবং কমিউনিস্টদের ন্যক্কারজনক ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পর একমাত্র সর্বভারতীয় বাঙ্গালি জননেতা— শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিও ইহারা সমানভাবে বিষোদ্গার করিয়াছে এবং অদ্যাবধি করিয়া চলিয়াছে। যে 'পশ্চিমবঙ্গ' নামক রাজ্যটিতে বসিয়া কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও তৃণমূলিরা এতকাল রাজনীতি করিয়াছে, সেই রাজ্যের স্রষ্টা শ্যামাপ্রসাদকে ইহারা স্বীকার করে নাই, কোনোদিন সম্মান প্রদর্শন করে নাই। উপরন্তু তাঁহাকে সাম্প্রদায়িক অভিধায় ভূষিত করিয়াছে। শ্যামাপ্রসাদই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি প্রথমাবধি দেশভাগের বিরোধিতা করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে যখন দেশবিভাগ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল এবং বঙ্গপ্রদেশ যখন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন শ্যামাপ্রসাদ তাহার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত সংগঠিত করিয়া পাকিস্তানের কবল হইতে বঙ্গের হিন্দুবহুল পশ্চিমাংশ লইয়া বঙ্গবিভাগের দাবি জানাইয়াছিলেন। এই কার্যে তাঁহাকে বহু বঙ্গমনীষী সমর্থন করিয়াছিলেন। তাহারই ফলস্বরূপ ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষার ভূমি হিসাবে 'পশ্চিমবঙ্গ' নামক রাজ্যটির আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে। এই বাস্তব সত্য কথাটি কংগ্রেস, কমিউনিস্ট এবং তাহাদের উপজাত দলগুলি কোনোদিন স্বীকার করে নাই। বিগত পনেরো বৎসর যে রাজনৈতিক দলটি পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাজ্যে এক নৈরাজ্যের পরিবেশ রচনা করিয়াছিল এবং শুধুমাত্র ভারতে নহে, সমগ্র বিশ্বে বাঙ্গালির সম্মান ভূলুণ্ঠিত করিয়াছিল, তাহারা তো ২০ জুনকে অস্বীকার করিয়া পয়লা বৈশাখকে রাজ্যদিবস ঘোষণা করিয়াছিল। বঙ্গাব্দের সহিত পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির যে কোনোপ্রকার যোগসূত্র নাই, সেই ইতিহাস জ্ঞানটুকুও তাহাদের ছিল না। পশ্চিমবঙ্গবাসীর সৌভাগ্য, বাঙ্গালির সৌভাগ্য যে, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের রাহুমুক্তি ঘটাইয়া বাঙ্গালি তাহাদের রাজ্যের সৃষ্টিকর্তা শ্যামাপ্রসাদকে পুনরায় বরণ করিয়া যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করিয়াছে।

বস্তুত, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই স্বল্প সময়ের শিক্ষা সংস্কারের কথা শুধু এই রাজ্যের নহে, সমগ্র ভারতের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করিয়া থাকেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পত্রালাপে ইহার কিছু ঝলক রহিয়াছে। শিক্ষা সংস্কার ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় পাইয়া বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহাকে যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। এহেন শিক্ষাবিদ শ্যামাপ্রসাদকে তৎকালীন ব্রিটিশ-ইসলামি শাসনে হিন্দুদের দুরবস্থা দেখিয়া রাজনীতির অঙ্গনে পদার্পণ করিতে হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে প্রাদেশিক আইন সভায় জয়লাভ করিয়া বঙ্গপ্রদেশের বিরোধী দলনেতা হইয়াছিলেন। পরে বীর সাভারকরের প্রেরণায় হিন্দু মহাসভায় যোগদান করিয়া ক্রমে তাহার সভাপতির দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। শ্যামা-হক মন্ত্রীসভায় অর্থমন্ত্রীর দায়িত্বও সুচারুরূপে পালন করিয়াছিলেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রীসভায় শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া উল্লেখযোগ্য কার্যসাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু নেহরু-লিয়াকত চুক্তি কার্যকর না হওয়া এবং কাশ্মীর নীতিতে নেহরুর সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ করিয়া ভারতীয় জনসঙ্ঘ নামক রাজনৈতিক দল তৈরি করিয়া হিন্দু স্বার্থ রক্ষা এবং ভারতের পুনর্গঠনে ব্রতী হইয়াছিলেন। ভারতের অখণ্ডতার পূজারি ড. শ্যামাপ্রসাদ জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সমমর্যাদা প্রদান করিবার জন্য আন্দোলন করিয়া ১৯৫৩ সালে কাশ্মীরে প্রবেশ করিলে শেখ আব্দুল্লার পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। ২৩ জুন কারাবন্দি অবস্থায় তাঁহার রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে। কাহাদের অঙ্গুলিহেলনে তাঁহাকে অকালমৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছে, তাহা আজ দেশবাসীর নিকট জলের ন্যায় পরিষ্কার। এই মহান দেশনায়ককে যাহারা সহ্য করিতে পারে নাই, যাহারা তাঁহাকে নিরন্তর গালিবর্ষণ করিয়াছে, তাঁহাকে হত্যা করিয়া যে পাপ করিয়াছে, তাহার ফলভোগ তাহাদের করিতে হইতেছে। ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল আজ ভারতের কেন্দ্র এবং অধিকাংশ রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, আর তাহারা আজ অস্তমিত। শ্যামাপ্রসাদের আদর্শের মৃত্যু ঘটে নাই। তিনি শাশ্বত, চির অম্লান। তিনি প্রত্যেক দেশবাসীর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিরাজ করিতেছেন।

সুভাষিতম্

তৎ কর্ম যৎ ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।
আয়াসায়াপরং কর্ম বিদ্যা অন্য শিল্পনৈপুণম্।।

অর্থ ঃ কর্ম সেটিই যা বন্ধনের কারণ হয় না, এর অতিরিক্ত সমস্ত কর্ম বৃথা প্রয়াস মাত্র। প্রকৃত বিদ্যা তাই-ই যা বন্ধন থেকে মুক্ত করে। এর অতিরিক্ত অন্য বিদ্যা কেবল শিল্পনৈপুণ্য মাত্র।

অপ্রাসঙ্গিক হিন্দু বিরোধিতার তোয়াক্কা না করে ‘হিন্দু হোমল্যান্ড’ প্রতিষ্ঠাই এখন লক্ষ্য

বঙ্গভূমি ত্বয়া হিন্দুভূমে

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

২২ জানুয়ারি ২০২৪ ভগবান রামলালা ফিরেছিলেন তাঁর নিজগৃহ অযোধ্যায়। প্রতিষ্ঠা হয় শ্রীরামলালার মন্দির। ২০ জুন ২০২৬। ১৯৪৭-এর পর বাঙ্গালি হিন্দুরা এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গকে তাদের নিজগৃহ হিসেবে পেল। মহা সমারোহে পালিত হলো আট দশক ধরে আটকে থাকা ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’-এর বাস্তব। ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বেঁচে থাকলে এই দিনটি কীভাবে পালন করতেন তা অনুমান করা অসম্ভব। দিবসের প্রধানতম ঋত্বিক হিসেবে তিনি যে কাজটি করে গিয়েছেন তার সার্থকতম ফসল এই রাজ্যে বিজেপির ক্ষমতায় আসা। তা যে তিনি হৃদয়াবিষ্ট করতেন তা হলফ করে বলা যায়। তাই এই দিনটির যারা বিরোধিতায় নেমেছে সেই ক্ষয়ে যাওয়া বিদেশি বামপন্থী আর পাশ্চাত্যবাদী কংগ্রেসিদের অবান্তর চীৎকারকে কোনোমতেই আমল দেওয়া উচিত নয় । তাতে এই দিনটির মর্যাদা আর তার ঋত্বিকের মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হবে। ভারত স্বাধীন হওয়ার কয়েক মাস আগে যারা ওই দিবসটিকে জীবন্ত রূপ দিয়েছিলেন তারা আজ কেউ নেই। পরবর্তীতে ফাউ হয়ে পড়ে রয়েছে কিছু খুচরো রাজনৈতিক ভাতাজীবী। হিন্দু বিরোধী সেই পাপের ফসলেরা এক মিথ্যার অনুবৃত্ত তৈরি করে তার থেকে ব্যবসায়িক ফয়দা নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। ঘটনায় অনুবৃত্তান্তকে বিকৃত করে ক্রমাগত হিন্দু বিরোধিতা চালিয়ে যাচ্ছে। শেষ লড়াই হিসেবে ইতিহাস বনাম অনৃতভাষণে ন্যারেটিভের জাল তৈরি করছে। ফয়দা লুটছে কিছু পেশাদার বাগ্মী আর বাচিক নেতা। একসময় এরা শাসকের কাছে নিজেদের ভোট ও আত্মা বিক্রি করে জীবনযাপন করত। এখন তারা ইতিহাসের কটু নাটক তৈরি করছে। আঙুল দিয়ে সূর্য ঢাকার মতো তারা ‘হিন্দু হোমল্যান্ড’-এর সত্যকে ঢেকে ফেলতে চাইছে। মিথ্যার যুক্তিজাল তৈরি করে হিন্দু বাঙ্গালিকে তারা বেঘর করতে চায়। স্বাধীনতার সময় থেকে তাদের পূর্বসূরীরা নির্লজ্জ মুসলমান তোষণের চক্রান্ত করেছিল। নির্মমভাবে তা মুছে ফেলার সময় এসেছে।

এবারের রাজ্য ভোটে বিদেশিরা ৯৪ শতাংশ আসনে নিদারুণভাবে পর্যুদস্ত হয়। তারা ৪.৪৬ শতাংশ ভোট পায় আর পাশ্চাত্যবাদীরা (কংগ্রেসিরা) মাত্র ২.৯৯ শতাংশ। ২০২১-এর ভোটেও তারা নির্লজ্জভাবে পরাজিত হয়। ভারতকেশরীর স্বপ্ন ছিল পশ্চিমবঙ্গকে হিন্দুদের নিশ্চিন্ত বাসভূমি ও আশ্রয়স্থল করে গড়ে তোলা। বিরোধীরা চেয়েছিল তাতে অশান্ত সাম্প্রদায়িক বিষ ঢালতে। ইতিহাসের চলতি চাকায় এখন হিন্দু বাঙ্গালির দয়াতেই এই ভারত-বিরোধী আর হিন্দু বিরোধীদের টিকে থাকতে হবে। বিদেশিরা ইতিহাস বিকৃতি আর অনৃতভাষণে পটু । তাই তাদের নেতারা ‘যতদূর মনে পড়ে’ নামে গ্রন্থ লেখেন। সব যাচাইয়ের পর কাউকে গৃহে ডেকে ‘অনুমোদিত জীবনী’ বলে বই লেখান। অবশ্য ‘কী মনে পড়ে না’ আর কোনটা ‘অননুমোদিত জীবনী’ তার হদিশ নেই। একেই বলে কথার জলিয়াতি। আর পালানোর যুক্তি।

> **‘পশ্চিমবঙ্গ’ নামকে ছাঁটাই করে যারা ‘বাংলা’ বলে চালানোর চেষ্টা করেছিল আজ তারা রাজনৈতিক পোকায় পরিণত হয়েছে। রাজ্যবাসী তাদের ক্ষমা করেনি।**

বিদেশি নেতা জ্যোতি বসু তাই-ই করেছিলেন। তাই দলের কোনো সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক ভুল চিহ্নিত করলেও হিন্দু বাঙ্গালির জন্য বঙ্গ বিভাগের পক্ষে তার সমর্থনকে তিনি তা বলে চিহ্নিত করেননি। তথ্য বলছে, ভারতকেশরীর প্রস্তাবকে সমর্থন করেছিলেন। ভারতকেশরীর নাগাল পাওয়া ওই দু'দল আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ হিন্দু বিরোধিতার ভিতর দিয়েই তাদের উত্থান। তাই হিন্দু বাঙ্গালিকে অগ্রাহ্য করার জন্য তারা ভারতবর্ষের মানুষকে শিখণ্ডী করেছিল। পশ্চিমবঙ্গকে হিন্দু হোমল্যান্ড বা হিন্দুভূমি হিসেবে গড়ে তোলার কথা রাজ্যপাটে বারবার লেখা হয়েছে। বলা হয়েছে কেন তা এখন প্রাসঙ্গিক। সে স্বপ্ন পূর্ণ হতে চলেছে।

ভারতকেশরী তাঁর ‘স্বপ্নের পশ্চিমবঙ্গ’ দেখে যেতে পারেননি। আট দশক ধরে আটকে থাকা সে ভাবনা তাঁর কৃতিত্ব। হিন্দুদের নিজ গৃহ স্থাপনের সর্বান্তঃকরণ চেষ্টার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে রাজ্যের মানুষ নতুনভাবে আস্বাদ করছে। হিন্দু আর পশ্চিমবঙ্গ-বিরোধী শত্রুদের মুখে ছাই দিয়ে তা করা হচ্ছে। ইতিহাসের গতিকে যে রোখা যায় না বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যের মানুষ তা বুঝছে। তারা এক নতুন ধরনের সাংস্কৃতিক জাগরণের সঙ্গী হয়ে উঠেছে। ভারতকেশরীর দেখিয়ে দেওয়া পথ ধরেই তা এগোচ্ছে। ‘পশ্চিমবঙ্গ’ নামকে ছাঁটাই করে যারা ‘বাংলা’ বলে চালানোর চেষ্টা করেছিল আজ তারা রাজনৈতিক পোকায় পরিণত হয়েছে। রাজ্যবাসী তাদের ক্ষমা করেনি। বিচ্ছিন্নতাবাদ ও কোনোরকম হিন্দু বিরোধিতাও এই রাজ্যের মানুষ আর সহ্য করবে না।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

শ্যামাপ্রসাদ শুধু বঙ্গ নয়, বাংলা বানানেরও রক্ষক

পিনাকপাণি ঘোষ

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাম্প্রদায়িক। এই বাংলার তথাকথিত 'গুণীজন'রা এই ভাবেই তো পরিচয় দেন। কিন্তু তাঁর জীবন বলে যে, এই 'পশ্চিমবঙ্গ'-এর রক্ষকও শ্যামাপ্রসাদ। আবার তাঁর জীবন এটাও বলে যে, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলা ভাষার জন্য, বাংলা বানানকে নীতিবদ্ধ করার জন্য যে লড়াই করেছেন তা অনন্য। যদিও তা নিয়ে আলোচনা হয় না বললেই চলে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবাদপ্রতিম উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ('বাঙ্গলার বাঘ' নামে যিনি পরিচিত) পুত্র শ্যামাপ্রসাদের শিক্ষা জীবন নিয়ে আলোচনা হলেও শিক্ষা ক্ষেত্রের প্রশাসক হিসাবে আলোচনা হয় না বললেই চলে। স্নাতক স্তরে ইংরেজি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া শ্যামাপ্রসাদ পিতার নির্দেশে স্নাতকোত্তর স্তরে বাংলা নিয়ে পড়েন। আবার আইনবিদ্যাতেও তিনি পারদর্শিতা দেখান। জীবনীকাররা বলেন, শ্যামাপ্রসাদের ক্লাসে অন্য কোনও মেধাবী ছাত্র পড়তেই চাইত না কারণ সকলের ভাবনা ছিল, শ্যামাপ্রসাদই সেরা হবে। আর হতোও সেটা।

লোকসভা সেক্রেটারিয়েটের 'এমিনেন্ট পার্লামেন্টারিয়নস্' নামে যে বই রয়েছে তাতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে লেখা রয়েছে, 'ছাত্রবয়স থেকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে বাবাকে সাহায্য করতেন শ্যামাপ্রসাদ। ১৯২৩ সালে স্যার আশুতোষের মৃত্যু হয়। অগত্যা শিক্ষাক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদকে আসতেই হয়, যদিও তখনও তিনি ছাত্র।' এটা আজকের সময়ে কল্পনা করা কঠিন। অনেকেই নেপোটিজম্ বলবেন। কিন্তু স্বাধীনতাপূর্ব বাঙ্গলার পরিস্থিতি ছিল অন্য রকম। পিতার মৃত্যুর পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সংস্থা, সেনেটে নির্বাচিত হন ২২ বছরের শ্যামাপ্রসাদ। পড়াশোনাও শেষ হয়নি তখন। আর ১৯৩৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে কমবয়সি উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হন তিনি। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি ওই পদে ছিলেন।

এই চারটে বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক কিছুই বদলে যায়। তাঁর উদ্যোগে অনেক নতুন বিষয় যুক্ত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। মহিলাদের জন্য বিশেষ পাঠ্যক্রম এবং গৃহবিদ্যার পঠনপাঠন যুক্ত করেন শ্যামপ্রসাদ। কৃষিবিদ্যার লেখাপড়ার শুরুও তাঁর হাতেই। চিনা ও তিব্বতীয় ভাষা নিয়ে চর্চার শুরুও তাঁর হাতে। সেই সময়ে স্কুলশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উপযুক্ত নিয়মই ছিল না। শ্যামাপ্রসাদ সবার আগে স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উপরে তিনি জোর দেন।

এই সব পরিবর্তনের মধ্যেই ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রাষ্ট্রপ্রেম এবং দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। আবার ব্রিটিশ-ভারতে তিনিই প্রথম ইংরেজির আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। অনেকে মনে করেন শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান ছিল এটাই। আশি বছর ধরে চলা ইংরেজি ভাষার একাধিপত্য ভাঙেন তিনি। ছাত্র-ছাত্রীদের তিনি বাংলা মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর তিনিই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে 'বিশিষ্ট প্রফেসর' হিসেবে নিয়োগ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর তার পরে তৈরি হয় ইতিহাস; ১৯৩৭ সালে প্রথম বাংলা ভাষায় সমাবর্তনী ভাষণ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। উপাচার্যের আসনে ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

আজ যাঁরা ড. শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম শুনেই নাক সেঁটকান তাঁরা কি এগুলো অস্বীকার করবেন? মনে রাখবেন সেই সময়ে বাংলার হিন্দিভাষী বা উর্দুভাষীদের কথাও ভেবেছেন শ্যামাপ্রসাদ। হিন্দি এবং উর্দু ভাষার শিক্ষাকেও প্রাধান্য দিয়েছিলেন ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রাণপুরুষ শ্যামাপ্রসাদ। আবার পড়শি রাজ্যের অহমিয়া ভাষার শিক্ষা চালু করেছিলেন স্নাতক স্তরে। তাঁর আমলেই কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, জনস্বাস্থ্য, পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ববিদ্যা, অঙ্ক এবং অ্যারোনটিক্স শাখায় পঠনপাঠনের শুরু।

এবারে আসা যাকা বাংলা বানান প্রসঙ্গে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন সেনেটের সদস্য সেই সময়েই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা বানানের সংস্কার নিয়ে চিন্তিত। তা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে চিঠিও লিখেছিলেন। আর তার পরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে 'পার্ট-টাইম প্রফেসর' পদে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিষয়টি সহজ ছিল না। কবি শ্যামাপ্রসাদের পরামর্শ চেয়ে চিঠিতে লিখেছিলেন— 'বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রেণীতে আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে বলে দেশে একটা অসন্তোষ সৃষ্টি করা হোলো।... আমার দেশের লোকে অনেকে আমার প্রতি নিষ্ঠুর, তাদের নির্মমতাকে জাগরূক করে তোলবার উপলক্ষ্য দিচ্ছি বলে মন আমার সংকোচ বোধ করচে।' (২১/০৭/১৯৩২) প্রত্যুত্তরে (২৪/০৭/১৯৩২) কবিকে আশ্বস্ত করে শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন, 'দু-চারজন সংকীর্ণমনা কি বলেচে না বলেচে সে দিকে আমাদের নজর দিলে চলবে না।... যে কাজের জন্য আপনার সাহায্য ভিক্ষা করেচি, সে কাজ যথার্থ দেশের মঙ্গলকারক... আপনি দ্বিধাশূন্য মনে এই আহ্বান গ্রহণ করুন, এই আমার প্রার্থনা।'

সব বাধা কাটিয়ে রাজশেখর বসুকে সভাপতি এবং চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে সম্পাদক করে ১৯৩৫ সালের নভেম্বরে 'বানান সংস্কার সমিতি' শুরু হলো। ১৯৩৬ সালে সমিতি বানান সম্পর্কিত নিয়ম ও বিধান সংবলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে এবং ভূমিকায় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে লেখেন যে, তিনি কবিগুরুর অনুরোধকে সম্মান দিতেই বাংলা বানানের রীতি নির্দিষ্ট করার ব্রত নেন। □

আলোর দিশারি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবাসী কৃতজ্ঞ। তবু দেশের সেকুলার রাজনৈতিক দল, কংগ্রেস, কমিউনিস্টরা তাঁর নিন্দায় মুখর। তাদের অভিযোগ— তিনি ও তাঁর সংগঠন হিন্দু মহাসভা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ তো দূরের কথা, তাঁরা নাকি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন, শ্যামাপ্রসাদ গান্ধীজীর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, তিনি বঙ্গকে দ্বিখণ্ডিত করে পশ্চিমবঙ্গকে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক নেতা ও ব্যবসায়ীদের মৃগয়াভূমি করে বঙ্গের সর্বনাশ করেছিলেন ইত্যাদি। বলাবাহুল্য এই কথাগুলির কোনোরকম সারবত্তা নেই, তবু এই কংগ্রেসে- কমিউনিস্টরা তোতাপাখির মতো তাঁর নিন্দা করে চলেছে। তাঁদের এই ভিত্তিহীন কথা অশিক্ষিত তো বটেই অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মনে বদ্ধমূল হয়েছে। অথচ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ এই সমস্ত সমালোচনার একেবারে ঊর্ধ্বে।

শিক্ষাবিদ হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন শ্যামাপ্রসাদ। তাঁর পিতা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মতো তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে পুরোমাত্রায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ দিতে চেয়েছিলেন। ইংরেজ শাসকের ঘোষিত বিজাতীয় শিক্ষানীতি তাঁর পিতার মতো তিনিও অগ্রাহ্য করেছিলেন।

১৯৩৫ সালে 'দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট' পাশ হয়। এই অ্যাক্টের বলে ১৯৩৭ সালে সারা দেশে নির্বাচন হয় এবং যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তারা সরকার গঠন করে। বঙ্গে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার কারণে ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী হন। মুসলিম লিগের সুরাবর্দি হক সরকারে অংশ নেয়। এবং দু'জনে মিলিতভাবে হিন্দু-দলন শুরু করে। হক প্রকাশ্যে বলেন, বঙ্গে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা করাই তার লক্ষ্য।

হিন্দুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুদান কমিয়ে মক্তবে অনুদান বৃদ্ধি করা হয়। ফলে ৫ বছরে ৮,৮৭১টি হিন্দু বিদ্যালয় হ্রাস পায় এবং সেই হারে মক্তবের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। হিন্দু বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় হিন্দু ছেলে-মেয়েরা মক্তবে পড়তে বাধ্য হয়। শিক্ষাক্ষেত্রের পাশাপাশি অন্য চাকরির ক্ষেত্রে হিন্দুদের সরিয়ে মুসলমানদের চাকরি দেওয়া শুরু হয়। হিন্দুদের আক্রমণ করতে সুবিধা হবে বলে তিনি হিন্দু পুলিশের সংখ্যা কমিয়ে মুসলমান পুলিশ নিয়োগ করেন। তার দলের উত্তেজনা সৃষ্টির ফলে হিন্দুদের উপর সংঘটিত আক্রমণ দ্রুত বাড়তে থাকে। ফলে ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে জেহাদি হামলার সংখ্যা সাড়ে চার গুণ বৃদ্ধি পায়। শুধু শিক্ষা ও চাকরি নয়, আর্থিক দিক দিয়ে হিন্দুদের পঙ্গু করার জন্য তিনি ১৯৩৮ সালে 'বেঙ্গল টেন্যান্সি অ্যাক্ট' পাশ করেন। মজার কথা, হিন্দুদের সার্বিকভাবে দমন করেও হক-সুরাবর্দি এবং তাদের দল 'মুসলমান বিপন্ন' এই জিগির দিতে থাকেন। মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হিন্দুদের জোর করে ধর্মান্তরণে জোর দেওয়া হতে লাগল।

এমতাবস্থায় বঙ্গপ্রদেশে হিন্দুসমাজ রক্ষার্থে শ্যামাপ্রসাদের হিন্দু মহাসভায় যোগদান। হক ও সুরাবর্দির যৌথ উদ্যোগে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে গান্ধীর কংগ্রেস নীরব দর্শক ছিল। এই সময় তিনি কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের হিন্দুবিরোধী কার্যকলাপে হিন্দুরা বিপন্ন দেখে বিপ্লবী বীর দামোদর সাভারকরের হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন এবং অচিরে গান্ধী ও জিন্নার ভয়ঙ্কর নীতির বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজকে সংগঠিত করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি জব্বলপুরে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে তীব্র ভাষায় কংগ্রেসকে মুসলিম তোষণের জন্য দায়ী করেন।

বামপন্থী ইতিহাসবিদরা দাবি করেন যে, সুভাষচন্দ্র শ্যামাপ্রসাদ ও হিন্দু মহাসভার তীব্র বিরোধী ছিলেন। তাদের নিজেদের প্রচারিত পুস্তকে তারা উল্লেখ করে যে, টাউন হলে অনুষ্ঠিত একটি সভায় আমন্ত্রিত শ্যামাপ্রসাদকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করার জন্য সুভাষচন্দ্র কিছু লোকজন প্রেরণ করেন। ইতিহাস কিন্তু তা বলে না। কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে ফরোয়ার্ড ব্লক ও হিন্দু মহাসভার জোট গঠনের প্রক্রিয়ায় দু'টি ওয়ার্ডে প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে কিঞ্চিৎ মতবিরোধের কারণে এই জোট শেষ পর্যন্ত গঠিত হয়নি। কিন্তু তার ফলে সুভাষচন্দ্র লোক পাঠিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদকে আক্রমণের জন্য— এর উল্লেখ সমকালীন কোনো গ্রন্থ বা কোনো পত্রপত্রিকায় নেই। শ্যামাপ্রসাদ বা সুভাষচন্দ্র কেউ এই বিষয়ে কোনোদিন কিছু ব্যক্ত করেননি। কয়েকটি ইস্যুতে মতবিরোধ থাকলেও তাঁদের সম্পর্ক কোনোদিনই তিক্ততার পর্যায়ে যায়নি। বামপন্থীরা নিজেদের প্রকাশিত পুস্তকে বিভিন্ন উদ্ভট দাবি করে। তাদের দাবি— সুভাষচন্দ্র নাকি একটি সভায় শ্যামাপ্রসাদকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'আপনি যদি বঙ্গে একটি রাজনৈতিক সংস্থা হিসেবে হিন্দু মহাসভাকে

প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন তাহলে তা আমি হতে দেব না। দরকার হলে তাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করব।' বামপন্থী প্রচারযন্ত্রের দাবি— সুভাষচন্দ্র আরেকটি সভায় বলেন, 'হিন্দু মহাসভা ভোটভিক্ষা করার জন্য হাতে ত্রিশূল নিয়ে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের মোতায়েন করছে। ত্রিশূল ও জাফরানি পোশাক দেখে হিন্দুরা শ্রদ্ধায় মাথা নত করছে। ধর্মের অপব্যবহার করে এবং অপবিত্র করে হিন্দু মহাসভা রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করছে। রাজনীতির ময়দানে এর নিন্দা করা সকল হিন্দুর কর্তব্য। এই বিশ্বাসঘাতকদের জাতীয় জীবন থেকে বিতাড়িত করুন।'

কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন সুভাষচন্দ্র। ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করার পর দেশজুড়ে ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রাম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক জোট গঠনে উদ্যোগী হন সুভাষচন্দ্র। ১৯৪০-এর জুনে বোম্বেতে হিন্দু মহাসভার জাতীয় নেতা বিপ্লবী বিনায়ক দামোদর সাভারকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সুভাষচন্দ্র। বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ছিলেন হিন্দু মহাসভা (জাপান চ্যাপ্টার)-র প্রধান। হিন্দু মহাসভার শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের গোপন আলোচনায় ঠিক হয় যে, উপযুক্ত সময়ে দেশত্যাগ করবেন সুভাষচন্দ্র। রাশিয়া, জার্মানি হয়ে তিনি জাপানে পৌঁছবেন। সেখানে জাপানের হাতে যুদ্ধবন্দি ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে তৈরি একটি বাহিনীকে তাঁর জন্য প্রস্তুত করে রাখবেন রাসবিহারী। সেই বাহিনীর নেতৃত্ব দেবেন সুভাষচন্দ্র। ভারতের সীমানার বাইরে থেকে তিনি প্রবলভাবে ব্রিটিশ শক্তিকে ধাক্কা দেবেন। তার আগে সাভারকর-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ব্রিটিশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীতে ভারতীয়দের যোগদানে উৎসাহিত করবেন। সুভাষচন্দ্রের সেনাবাহিনী ভারতের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ভারতীয় সেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতিতে ঘরে-বাইরে সেই বিপর্যয় সামলাতে ব্যর্থ হবে ব্রিটিশ সরকার। এবং একমাত্র তখন তারা ভারত ত্যাগে বাধ্য হবে। এইভাবে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা তৈরি করেন এই বরেণ্য বিপ্লবীরা। ইম্ফল-কোহিমা যুদ্ধ জয়ের পরও নানা বিপর্যয়ের কারণে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে সাইগন হয়ে টোকিয়োর দিকে অগ্রসর হন নেতাজী এবং তারপর ঘটে তাঁর রহস্যময় অন্তর্ধান। কিন্তু তারপর ব্রিটিশ-ভারত নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীতে ঘটে যায় বিদ্রোহ। সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভারত ছাড়তে বাধ্য হয় ব্রিটিশ। ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। এর ঠিক আট বছর পর একই দিনে (১৯৫১-র ২১ অক্টোবর) 'ভারতীয় জনসঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

মুসলিম লিগ শাসনাধীন কলকাতায় হিন্দু নির্যাতন খুবই প্রত্যাশিত ছিল। বঙ্গের প্রতিটি জেলায় নিয়মিত হিন্দুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ সংঘটিত হওয়ার পিছনে দুটি উদ্দেশ্য ছিল— (১) হিন্দুদের আর্থ- সামাজিক ক্ষমতা খর্ব করা। (২) কোরানের নির্দেশ মেনে হিন্দুদের উচ্ছেদ করে সেই এলাকায় ইসলামি দেশ বা দার-উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সন্ত্রাস ও নির্যাতন চালিয়ে হিন্দুদের বিতাড়িত করলেও কলকাতা দখল না করা পর্যন্ত মুসলমানদের শান্তি ছিল না। কলকাতা ছিল হিন্দুদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক রাজধানী। ১৯২৬ সালে রাজনীতিতে নেমেই সুরাবর্দি কলকাতা দখলের লক্ষ্যে হাঙ্গামা শুরু করেন। সেই সব হামলা দমন করে কলকাতার বাঙ্গালি ও ব্রিটিশ সরকার। কুড়ি বছর পরে বঙ্গের শাসনকর্তা হয়ে তিনি তার অসম্পূর্ণ ইচ্ছা পূরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট শুক্রবার হিন্দুদের উপর আক্রমণ শুরুর উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতা থেকে অমুসলমান পুলিশ কর্তাদের সরিয়ে প্রতিটি থানায় মুসলমান অফিসার নিয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি লালবাজারে বসে পুলিশ অফিসারদের হিন্দুদের হত্যার নির্দেশ দিতে থাকেন। কলকাতায় সুরাবর্দির আকস্মিক 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'-এর জন্য হিন্দু নেতারা প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু তিনদিন পরে প্রধানত বিপ্লবী গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতিরোধে মুসলিম লিগ গুন্ডারা পরাভূত হয়। সুরাবর্দির কলকাতা দখলের ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়। যেভাবে মাত্র এক দিনের মধ্যে সমস্ত হিন্দুদলকে একত্রিত করে সুরাবর্দির পুলিশ ও গুন্ডাবাহিনীকে কুপোকাত করেছিলেন তা গোপাল মুখার্জির অসাধারণ নেতৃত্বের পরিচায়ক।

১৯৪৭ সালের ২২ মার্চ লুই মাউন্টব্যাটেন ভারতের নতুন ভাইসরয় নিযুক্ত হয়েই ভারতের সমস্ত দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। সকলের সঙ্গে আলোচনায় বুঝতে পারেন যে, দেশের প্রধান দল কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ ভারত বিভাজনের পক্ষে। সেই হিসেবে তিনি ৩ জুন ভারত ভেঙে পাকিস্তান সৃষ্টির কথা বলেন। ভারতের মুসলমান-বহুল এলাকাগুলিকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন জিন্না। কিন্তু দেশভাগের সিদ্ধান্তের পর তিনি ও তার দল, আম্বেদকরের ভাষায় 'জমি দখলের খেলা'য় মেতে গেলেন। তিনি হিন্দুপ্রধান 'কলকাতা' দাবি করে বসেন। সুরাবর্দি আবার পুরনো খেলা শুরু করলেন। জিন্নার নির্দেশে তিনি স্বাধীন বঙ্গ রাখার পক্ষে সওয়াল করতে থাকেন। তার তৈরি ফাঁদে পড়েন শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায়, অখিলচন্দ্র বসু, কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু, তপশিলি জাতির নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। কিন্তু বঙ্গপ্রদেশের পশ্চিমাংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা স্বাধীন বঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করেন। সুরাবর্দির নেতৃত্বে ১৯২৬-এর জেহাদি হামলা, ১৯৪৬-এ 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস্' এবং নোয়াখালিতে হিন্দু নরসংহারের ঘটনা তাঁরা ভুলে যাননি।

ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁদের নেতৃত্ব দিলেন। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় আইনসভায় ৫৮-২১ ভোটে ভারতের মধ্যে একটি রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে 'পশ্চিমবঙ্গ'। তাতে বাঙ্গালি হিন্দুরা রক্ষা পায়। চরম পরিতাপের বিষয় যে, এখনও কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসিরা দেশ বিভাগের জন্য শ্যামাপ্রসাদকে দায়ী করে। সেদিন মুসলিম লিগ শাসনে বাঙ্গালি যে কী ভয়াবহ অস্তিত্বহীনতায় ভুগছিল তা তারা সুকৌশলে ভুলে যায়। □

ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : এক সাংস্কৃতিক সংস্করণ

ড. পিয়া সিনহা

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (৬ জুলাই ১৯০১—২৩ জুন ১৯৫৩) ভারতীয় রাজনীতি ও শিক্ষা জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। রাজনৈতিক পরিসরে তাঁর জাতীয়তামূলক ধারণা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জাতীয়তা সাংস্কৃতিক এবং অখণ্ড ভারতের চিন্তাপ্রসূত।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জাতীয়তাবাদী চেতনা মূলত তাঁর পিতা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দেশপ্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত। তবে, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চিন্তনে যে জাতীয়তাবাদী ভাবনা তা আরও গভীরে প্রোথিত। রাজনারায়ণ বসুর অগ্রণী কর্মকাণ্ডের দ্বারা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অনুপ্রাণিত হন এবং ১৯৫১ সালে জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার সময় উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর আদর্শগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন।

রাজনারায়ণ বসুর দেশীয় মহিমা ও গর্ব এবং সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধের পথপ্রদর্শক ভূমিকায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন হিন্দু মহাসভা ও ভারতীয় জনসঙ্ঘের মৌলিক আদর্শগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। আবার, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন উপন্যাসের দ্বারা ড: মুখোপাধ্যায়ের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধ পুষ্ট হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও বন্দে মাতরমের দ্বারা ড: মুখোপাধ্যায়ের মনে মাতৃভূমির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জাগরিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠে ভারত রাষ্ট্রকে এক দিব্য মাতৃদেবী রূপে রূপায়ণ করেছেন, যা বিমূর্ত দেশপ্রেমকে এক তীব্র, আবেগঘন আধ্যাত্মিক কর্তব্যে রূপান্তরিত করেছিল। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবোধের মন্ত্রে দীক্ষিত হন। বঙ্কিমচন্দ্র যে ধর্মতত্ত্ব ও ভগবদগীতার শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে একটি সক্রিয়, সুশৃঙ্খল ও ঐক্যবদ্ধ সমাজের পক্ষে কথা বলেছিলেন, সেই একই আলোয় আলোকিত হয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সমমনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় যে আধ্যাত্মিক মহাজাগরণের বীজ বপন হয়েছিল, পরবর্তীতে ড: মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সেই চিন্তাবোধই প্রতিফলিত হয়েছিল। সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধ প্রসারে ড. মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্রের যৌথ অবদানকে সম্মান জানিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রিসার্চ ফাউন্ডেশন 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা' বর্তমানেও নিয়মিত আয়োজন করে থাকে। চন্দ্রনাথ বসুর সামাজিক সাংস্কৃতিক ধারণার দ্বারাও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

আবার, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে অরবিন্দ ঘোষ শুধুমাত্র একজন যোগীই নন, তিনি একজন রাজনৈতিক দূরদর্শী তাত্ত্বিক। ড: মুখোপাধ্যায়ের আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবোধ, বৃহত্তর ভারতীয় ঐক্য এবং জাতীয় শিক্ষা বিষয়গুলি অরবিন্দ ঘোষ বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। ঋষি অরবিন্দর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে ড: মুখোপাধ্যায় আত্মস্থ করেছিলেন যে জাতীয়তাবোধ তা শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিই নয়, বরং একটি আধ্যাত্মিক ব্রত। শ্রীঅরবিন্দর বিপ্লবী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে স্বাধীনতা-উত্তর পর্যায়ে ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিগতভাবে আলিপুর জেলের সেই সেলে প্রথম স্মৃতিফলকটি স্থাপন করেন, যেখানে ব্রিটিশরা ১৯০৮ থেকে ১৯০৯ সালের মধ্যে অরবিন্দকে বন্দি করে রেখেছিল।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের মাতা--- মীরা আলফাসা বলেছিলেন, 'যদি কেউ শ্রীঅরবিন্দের এক চতুর্থাংশও বুঝে থাকেন, তবে তিনি হলেন শ্যামাপ্রসাদ।' ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর রাজনৈতিক জীবনে অতিপ্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক ও আদর্শগত সমর্থন পেয়েছিলেন ভারত সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের কাছে। হিন্দু জাতির স্বার্থে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা ড: মুখোপাধ্যায় পেয়েছিলেন স্বামী প্রণবানন্দের কাছেই। তাঁর প্রায়োগিক আধ্যাত্মিকতা, সমাজসেবা এবং জাতপাত নির্বিশেষে হিন্দু ঐক্য সাধনের উপর গুরুত্ব এবং তার বাস্তবায়ন ড. মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক চিন্তাধারা, নেতৃত্ব তাঁর বিশ্বদৃষ্টিকে গভীরে প্রভাবিত করেছিল।

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতি সাধনে নিয়োজিত মানুষ নিজের অজান্তেই কখনো নিজেই এক প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠেন। ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেই অর্থে নিজেই এক প্রতিষ্ঠান। সেই প্রতিষ্ঠানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধের বীজমন্ত্রে। বিশ্বাস করতেন, ভারতের হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করেই একটি শক্তিশালী আধুনিক জাতি গড়ে তোলা সম্ভব। তিনি এই জাতিকে একটি অবিভাজ্য সাংস্কৃতিক একক হিসেবে দেখতেন। অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে ড: মুখোপাধ্যায় এক অখণ্ড ভারতের পক্ষে জোরালোভাবে কথা বলেছিলেন এবং যুক্তি দিয়েছিলেন যে জাতির অস্তিত্বের জন্য দেশের অখণ্ডতা অপরিহার্য। সংখ্যালঘু তোষণনীতির বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তথাকথিত সেকুলার নীতিও প্রত্যাখান করেছিলেন।

তিনি এমন একটি ভারতীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে ছিলেন যা তার সাংস্কৃতিক আত্মাকে প্রতিফলিত করবে। ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্ন পশ্চিমবঙ্গে বাস্তবায়িত করার সুযোগ সামনে এসেছে। সময় এসেছে রাজ্যের প্রতিটি মানুষের তাঁর কথাতেই চৈতন্য জাগ্রত করার— 'যে কাজই হাতে নাও না কেন, তা নিষ্ঠা, পুঙ্খানুপুঙ্খতা ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করো; কোনো কাজই অর্ধসমাপ্ত বা অসম্পূর্ণ রেখো না। তুমি নিজের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা না করা পর্যন্ত কখনো আত্মতৃপ্তি লাভ করবে না।' □

ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনই হলো বাঙ্গালির আশু কর্তব্য

বামপন্থী কু-বুদ্ধিজীবী এবং ইতিহাসবিদ পরিচয়ধারী ইতিহাস বিকৃতকারীদের এহেন প্রয়াস ব্যর্থ করে এরাজ্যের বুকে গত ২০ জুন উদ্‌যাপিত হয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস'। গত আট দশক অযোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব ক্ষমতাসীন থাকার কারণে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে যথার্থ সম্মান প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছে বাঙ্গালি।

ডাঃ মধুসূদন পাল

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মূলত শিক্ষাবিদ ছিলেন। তারপর একসময় তিনি কংগ্রেসের সদস্য এবং পরবর্তী পর্যায়ে হিন্দু মহাসভার সভাপতি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তাঁর কাজকর্ম স্বাভাবিক কারণেই অনেকটাই পর্দার পেছনে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ক্ষেত্রে এটা অনেক বেশি করে সত্য। তাঁর কাজকর্মের পরিধি বঙ্গপ্রদেশের বাইরে সমগ্র দেশব্যাপী এবং সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক। তাঁর গোপন কাজকর্ম কোনভাবেই ব্রিটিশের গোচরে এলে তিনি কোনো কাজই করতে পারতেন না।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের এবং সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কবিগুরুর যে গোপন সম্পর্ক ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য ব্রিটিশের বিরুদ্ধে, তার অনেকটাই পর্দার আড়ালে রয়ে গিয়েছে এবং তার অনেকটাই আজও অজানা।

বঙ্গীয় রাজনীতির এক দুর্ভাগ্যজনক সময় হলো ১৯৩৭। 'দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৫'-আইন অনুসারে ব্রিটিশ-ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ১৯৩৭ সালে নির্বাচন হয়েছিল এবং এই আইন অনুসারে, ব্রিটিশ-ভারতের অধীনস্থ প্রদেশগুলিকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছিল।

বঙ্গে সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তিনটি প্রধান দল— কংগ্রেস, মুসলিম লিগ ও কৃষক প্রজা পার্টি। সেই নির্বাচনে এই তিনটি রাজনৈতিক দলের কেউই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি চেয়েছিল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে একটা মন্ত্রীসভা তৈরি করতে যাতে মুসলিম লিগকে ক্ষমতার বাইরে রাখা যায়। প্রথমে গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রকে কথা দিয়েছিলেন যদি সুভাষচন্দ্র এরকম মন্ত্রীসভা তৈরি করতে সফল হন তিনি আশীর্বাদ করবেন। পরবর্তীকালে গান্ধীজী উল্টো সুরে গান গাইলেন। তিনি পেছন থেকে ছুরি মারলেন। কংগ্রেস চিরকালই 'হাইকমান্ড' নামক একটি অদৃশ্য শক্তির (অনেকটা 'ডিপ স্টেট'-এর মতো) অধীনস্থ।

এই অদৃশ্য শক্তি যা গান্ধীজীর আশীর্বাদ পুষ্ট, আসলে এটা ব্রিটিশের মদতপুষ্ট একটি শক্তি। ১৯৩৭ সালে এই রাজনৈতিক শক্তি বঙ্গে কৃষক প্রজা পার্টি ও কংগ্রেসের মিলিত সরকার গঠিত হতে দেয়নি। সুভাষচন্দ্রের চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় ফজলুল হক মুসলিম লিগের সঙ্গে প্রাদেশিক সরকার গঠনে বাধ্য হয়েছিলেন। এরপর মুসলিম লিগের অত্যাচার প্রবলতর আকার ধারণ করে বঙ্গের বিভিন্ন অংশে।

এই পরিস্থিতিতে হিন্দুদের সুরক্ষার জন্য রাজনীতির মঞ্চে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণায় রাজনৈতিক নেতৃত্বদানের গুরুভার এবং হিন্দুদের রক্ষার দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নিলেন তিনি। ১৯২৯ সাল থেকেই বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে, কংগ্রেস সদস্যরূপে নির্বাচিত। ১৯৩০ সালে কংগ্রেস লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বয়কট করায় তিনি কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করেন এবং স্বতন্ত্র সদস্যরূপে পুনরায় নির্বাচিত হন। ১৯৩৯ সালে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কলিকাতা অধিবেশনে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪০ সালে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত ছিলেন বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সর্বভারতীয় সভাপতির দায়িত্ব নির্বাহ করেন।

সুভাষচন্দ্র হিন্দুদের প্রতি মুসলিম লিগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে খুব বেশি কিছু বলতে পারেননি বলে অনেকের ধারণা। তার কারণ— সেইটা বলতে গেলে মুসলিম লিগ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু কথা বলতেই হতো। তিনি মুসলিম লিগের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হোক এটা হয়তো তিনি চাননি, কারণ সেই মুহূর্তে তাঁর কাছে ব্রিটিশ শক্তি 'এক নম্বর শত্রু' ছিল এবং হিন্দু-মুসলমান সংঘাতের জায়গাটি আরেকটি বড়ো কাঁটা ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সমস্যাটিকে বড়ো করে দেখতে হলে তাঁকে একই সঙ্গে দু'টো শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হতো। একটি ব্রিটিশ শক্তি, আরেকটি হচ্ছে জেহাদি শক্তি। কোনো পরিপক্ক রাজনীতিবিদ কখনো একই সঙ্গে দু'টো ফ্রন্টে

ফঃ ২

যুদ্ধ করেন না। তাঁর কাছে সেই মুহূর্তে ব্রিটিশ শক্তিকে দেশ থেকে তাড়ানোই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্রের রাজনীতি ছিল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রাজনীতি বঙ্গের মধ্যে বিশেষত সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাঁর রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের স্বার্থরক্ষা যখন মুসলিম লিগ বঙ্গপ্রদেশে ক্ষমতায় এসে গিয়েছে। তিনি নিজে মনেপ্রাণে ছিলেন অত্যন্ত উদার মনের এবং অসাম্প্রদায়িক। কিন্তু যেহেতু সেই সময় হিন্দুদের রক্ষার জন্য কোনো বড়ো নেতা এগিয়ে আসেননি তাই তাঁকে এই কাজটি করতে হয়। তিনি মনেপ্রাণে অত্যন্ত পরমতসহিষ্ণু ছিলেন। এটা জানতেন কৃষক প্রজা পার্টির নেতা ফজলুল হক, যিনি সেই সময় ছিলেন সমগ্র বঙ্গের মুসলমান নেতাদের মধ্যে সবথেকে উদার, সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত মুসলমান নেতা।

সেই সময়কার রাজনৈতিক প্রয়োজনে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর একটা আপাত বৈপরীত্য ছিল, কিন্তু একদম গভীরে ছিল সহযোগিতা। একজন কাজ করেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সেখানে তিনি ইসলামের প্রশ্নটিকে বেশি করে সামনে আনেননি, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তার সংগ্রামটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অন্যদিকে ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ হিন্দুদের স্বার্থরক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এটা ছিল একটা সহযোগিতা এবং এই যে সহযোগিতা ছিল দু'জনের মধ্যে সেটা বাইরে প্রকাশ হলে ব্রিটিশের সুবিধা হতো।

পরবর্তীকালে যখন ফজলুল হক মুসলিম লিগের ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক কাজকর্মে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন তখন তিনি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে এবং কংগ্রেসের একটা অংশ ও ফরওয়ার্ড ব্লকের সাহায্যে 'শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা' গঠন করেছিলেন। এটা প্রমাণ করে যে, ফজলুল হকের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ ও সুভাষচন্দ্রের গোপন সম্পর্কটা কোথায় ছিল। অবশ্য এটা হয়েছে সুভাষচন্দ্রের ভারত থেকে চলে যাওয়ার পরে।

আবার ১৯৪৫-এর নভেম্বরে লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ সৈনিকদের বিচারের প্রেক্ষাপটে ভারতব্যাপী ব্যাপক জন-আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সেই সময় বিভিন্ন শহর-সহ কলকাতা, দিল্লি প্রভৃতি স্থানে ব্রিটিশের গুলিতে অনেক যুবক প্রাণ দিয়েছিলেন। সেই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় ড. শ্যামাপ্রসাদ রাস্তায় নেমে এসেছিলেন জনগণের সকাশে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে। এত বড়ো মাপের আর কোনো নেতা সেসময় কলকাতা রাস্তায় নেমে আসেননি।

পরবর্তীকালে নেহরু'র বিভিন্ন দেশবিরোধী কার্যকলাপ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে হিন্দু স্বার্থবিরোধী কাজের জন্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করে ভারতীয় জনসঙ্ঘ তৈরি করলেন।

এর ঠিক আট বছর আগে— সিঙ্গাপুরে ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। আজাদ হিন্দ সরকার তৈরির দিনটি ছিল ২১ অক্টোবর ১৯৪৩ আর জনসঙ্ঘ তৈরির দিনটি হলো— ২১ অক্টোবর ১৯৫১।

সুভাষচন্দ্রের মনের গভীর ইচ্ছা ছিল বঙ্গের শাসন থেকে মুসলিম লিগকে দূরে সরিয়ে রাখা। গান্ধীর চক্রান্তে তাঁর সেই ইচ্ছাপূরণ হয়নি। ১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্রের দেশ থেকে চলে যাওয়ার পরে 'শ্যামা-হক' মন্ত্রীসভা তৈরির মধ্যে দিয়ে সুভাষচন্দ্রের সেই ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

'দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৫' অনুসারে ১৯৩৭ সালে ব্রিটিশ-ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচন হয়েছিল। এই নির্বাচনের পরে অসমে মুসলিম লিগ কিছু নির্দল এমএলএ-র সাহায্যে মুসলিম লিগ সরকার তৈরি করে।

বঙ্গে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি, কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ কেউই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র বসু ও ফজলুল হক চেয়েছিলেন বঙ্গপ্রদেশে কৃষক প্রজা পার্টি-কংগ্রেস জোট সরকার গঠিত হোক, যাতে মুসলিম লিগকে ক্ষমতার বাইরে রাখা যায় যা একটি সাম্প্রদায়িক দল। প্রথমে গান্ধী কথা দিয়েছিলেন যদি সুভাষচন্দ্র এই জোট গঠনে সফল হন, তিনি আশীর্বাদ করবেন। কিন্তু পরে তিনি মত পাল্টান এবং এই জোট গঠনের প্রক্রিয়াকে পেছন থেকে ছুরি মারেন। ফলে ফজলুল হক-কে মুসলিম লিগের সঙ্গে সরকার গঠন করতে বাধ্য হতে হয়।

প্রশ্ন হলো, গান্ধীজী কি কৌশলে মুসলিম লিগকে বঙ্গে শাসনের সুযোগ করে দিলেন না? মুসলিম লিগের মতো একটা ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দলকে কি গান্ধীজী সুকৌশলে বঙ্গপ্রদেশে ক্ষমতাসীন করে দিলেন না? আরেকটা প্রশ্ন, ১৯৩৭ সালে জওহরলাল ছিলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি। সেই সময় মুসলিম লিগ অসমে কয়েকজন নির্দল সদস্যের সাহায্যে মুসলিম লিগ সরকার তৈরি করেছিল। সেই সরকার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি শুরু করে এবং অসমে পূর্ববঙ্গ তথা ওপার বঙ্গ থেকে মুসলমানদের প্রবেশ করিয়ে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে থাকে।

১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। তারপরেই তিনি সেই সময়কার অসমের রাজধানী শিলঙে গিয়ে কয়েক দিন থেকে সমস্ত নির্দল সদস্যদের বুঝিয়ে সাদুল্লার (মুসলিম লিগের) সরকার থেকে তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করিয়ে সেই সরকারের পতন ঘটান। গোপীনাথ বরদলৈ-কে প্রধানমন্ত্রী (প্রিমিয়ার) করে অসমে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠা করে ফিরে এসেছিলেন।

আজ যে অসম-সহ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি ভারতের মধ্যে রয়েছে এবং পাকিস্তানে যায়নি তার মূল কারণ সেই দিন সুভাষচন্দ্র অসমে মুসলিম লিগ সরকারের পতন ঘটিয়েছিলেন। এই কাজটা তো নেহরু বা গান্ধী ১৯৩৭-এ করতে পারতেন। তারা করেননি কেন? এর অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে। কেন গান্ধী বঙ্গে কংগ্রেস-কৃষক প্রজা পার্টি সরকার গঠনের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রকে সম্মতি দিলেও পরবর্তীকালে কোন অজানা কারণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেন? এই বিশ্লেষণের জন্য এর আগের কয়েকটা দশকের ভারতের রাজনীতির দিকে তাকাতে হবে।

বঙ্গভূমি থেকে জন্ম নেওয়া ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামকে দুর্বল করার জন্য ১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভক্ত করা হয়েছিল। মুখে বলা হয়েছিল যে সুশাসনের প্রয়োজনে বাঙ্গলাকে ভাগ করা হয়েছে এবং এই বিভাজনের বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়। সেই তীব্র আন্দোলন বঙ্গভঙ্গ বাতিল করতে ব্রিটিশকে বাধ্য করেছিল।

ব্রিটিশ বুঝে গিয়েছিল যে, আগে থেকে তাদের সমর্থনকারী তল্পিবাহক কোনো রাজনৈতিক দল না তৈরি করলে কোনো পরিকল্পনা সার্থক করা যাবে না। তাই তারা ১৯০৬ সালে মুসলিম লিগ তৈরি করেছিল। এই মুসলিম লিগ তৈরি করতে ঢাকার শাহবাগে সারা ভারত থেকে যে মুসলমান নেতারা সমবেত হয়েছিলেন, সেই সম্মেলনের খরচ জুগিয়েছিলেন ঢাকার নবাব এবং সেই সময়কার বঙ্গের ব্রিটিশ গভর্নর। মুসলিম লিগ তৈরি করে ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আগমন ঘটিয়েছিল।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের জাতীয় অধিবেশনে গান্ধী খিলাফত রেজোলিউশন পাশ করিয়েছিলেন। ১৯২০-র কলকাতা কংগ্রেস গান্ধীকে জয় উপহার দিয়েছিল এবং তাকে সর্বভারতীয় নেতায় রূপান্তরিত করেছিল।

বঙ্গের অগ্রগণ্য রাজনীতিবিদ চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল-সহ বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়ের মতো দেশবরেণ্য নেতৃত্ব ও তাঁদের অনুগামীরা, অ্যানি বেসান্ত, মদনমোহন মালব্য, এমনকী জিন্না--- সবাই এই খিলাফত রেজোলিউশনের বিরুদ্ধে ছিলেন।

একমাত্র গান্ধীর সমর্থক ছিল আলি ভ্রাতৃদ্বয় ও মোতিলাল নেহরু। গান্ধী বিজয়ী হয়েছিলেন কারণ বোম্বে থেকে ট্রেন ভর্তি প্রচুর লোক এসে মঞ্চে এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। এই ট্রেনগুলোর সমস্ত খরচ রাজকুমার মিয়া, মহম্মদ চেতালি-র মতো বোম্বের ধনী ব্যবসায়ীরা দিয়েছিল। পশ্চিম ভারত থেকে অনেকগুলো ট্রেন ভর্তি করে লোক আনা হয়েছিল কংগ্রেসের প্যান্ডেল পূর্ণ করার জন্য, তাদের নায়কের প্রস্তাব ভোটে পাশ করানোর জন্য এবং কংগ্রেসকে জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলে পরিণত করার জন্য। পশ্চিম ভারতের মুসলমান বণিক শিল্পপতি ও একাংশ মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের টাকায় কংগ্রেসের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটল এবং কংগ্রেসকে নিম্নবর্গের বিপ্লবী দলে পরিণত করা হলো। এর পরের ঘটনা অনেকেরই জানা [Ref. JINNAH OF PAKISTAN– Stanley Wolpert— Oxford University Press– Pages. 69, 72,75, 80, 81 এবং এই লেখকের বই— 'বিচিত্রা'; অধ্যায় : খিলাফত আন্দোলন, দেশবন্ধু ও গান্ধী, পৃষ্ঠা : ৭২ থেকে ৮৮]। খিলাফত আন্দোলনের নামে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে কেরালাতে ইসলামের তরবারিতে অসংখ্য হিন্দু নিহত হলো, অগণিত হিন্দু মা-বোন যৌন নির্যাতনের শিকার হলেন। ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আরও তীব্রতর হলো এবং এই সবকিছু হলো কংগ্রেসের ওই খিলাফত মুভমেন্টের ফলস্বরূপ। প্রশ্ন হলো, এই সব আন্দোলন করে গান্ধী কি সত্যি ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিলেন না ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে বলশালী করেছিলেন? তিনি নিশ্চিত ভাবে পাকিস্তান তৈরির পথ প্রশস্ত করেছিলেন।

এখানেই উত্তর মিলবে কেন গান্ধী ১৯৩৭ সালে বঙ্গে কৃষক প্রজা পার্টি ও কংগ্রেসের যৌথ সরকার তৈরি করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলেন, যার ফলে মুসলিম লিগ বঙ্গের মসনদে আসীন হয়। ভুলে গেলে চলবে না যে, সেই সময় বঙ্গ ছিল ব্রিটিশ-ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য— জনসংখ্যায়, অর্থনীতিতে, শিল্পে, শিক্ষায় ও রাজনৈতিক গুরুত্বে। সেই বঙ্গকে সুকৌশলে গান্ধীজী মুসলিম লিগের হাতে তুলে দিলেন।

আর এখান থেকেই প্রশ্নের উত্তর আসবে যে, গান্ধী বা তার রাজনৈতিক শিষ্য জওহরলাল নেহরু কেন ১৯৩৭-এ অসমে মুসলিম লিগ সাদুল্লা সরকার ভাঙার চেষ্টা করেননি?

সুভাষচন্দ্র ১৯৩৭-এ কৃষক প্রজা পার্টি-কংগ্রেস যৌথ সরকার তৈরি করতে পারেননি কংগ্রেস হাইকমান্ড [invisible HIGH-COMMAND]-এর বাধার জন্য। এটা দুর্ভাগ্য ও দুঃখের।

১৯৪১-এর ডিসেম্বর মাসে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ফজলুল হককে সঙ্গে নিয়ে সুভাষচন্দ্রের সেই অপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছেন 'শ্যামা-হক' মন্ত্রীসভা গঠন করে। শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা ছিল বঙ্গকে মুসলিম লিগের হাত থেকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা। শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা মাত্র ১১ মাস স্থায়ী হয়েছিল। এই সরকারকে কংগ্রেসের গান্ধীবাদী অংশ সমর্থন করেনি, সেইসঙ্গে কাজ করেছিল ব্রিটিশ এবং মুসলিম লিগের চক্রান্ত। ১৯৪২-এর নভেম্বরে সেই সরকারের পতন ঘটে এবং সেই সঙ্গে বঙ্গের সৌভাগ্য লাভের সুযোগের পরিসমাপ্তি ঘটে। মুসলিম লিগ শক্তিশালী হয় এবং ভারত বিভাজনের পথ প্রস্তুত হয়। ভারত বিভাজনের পরবর্তী সময়ে বঙ্গে বিভাগের প্রয়োজন হয়েছিল। উদ্বাস্তু বাঙ্গালি হিন্দু-সহ বঙ্গের আপামর অমুসলমানদের বাঁচার একমাত্র আশ্রয়স্থল হিসেবে পশ্চিমবঙ্গকে তৈরি করেছিলেন ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ঠিক একই কারণে, একই আবহে পঞ্জাবকেও বিভক্ত করা হয়।

কিছু বাঙ্গালি কু-বুদ্ধিজীবী এখনো মিথ্যা কথা বলে চলেন যে, দেশভাগের জন্য এবং বঙ্গ বিভাগের জন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দায়ী। এটা একটা মিথ্যাচার এবং বাঙ্গালির ত্রাতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে কালিমালিপ্ত করার নোংরা চেষ্টা। বামপন্থী কু-বুদ্ধিজীবী এবং ইতিহাসবিদ পরিচয়ধারী ইতিহাস বিকৃতকারীদের এহেন প্রয়াস ব্যর্থ করে এরাজ্যের বুকে গত ২০ জুন উদ্‌যাপিত হয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস'।

গত আট দশক অযোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব ক্ষমতাসীন থাকার কারণে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে যথার্থ সম্মান প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছে বাঙ্গালি। আগামীদিনে তাঁর শ্রীচরণে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁর অবদানকে স্মরণ-মনন করাই হলো বাঙ্গালির আশু কর্তব্য। □

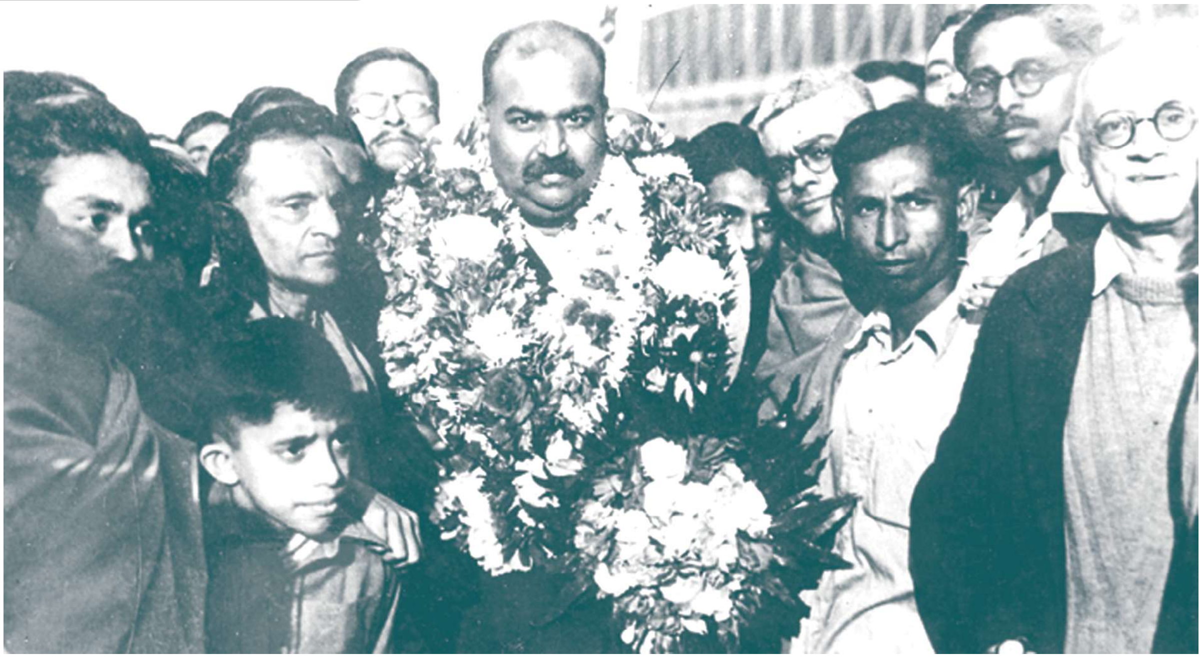

সর্বভারতীয় হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯৪২)

বঙ্গবিভাগ থেকে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম
হিন্দু বাঙ্গালির পরিত্রাতা শ্যামাপ্রসাদ

ড. প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়

ভারত বিভাগের ইতিহাস বিংশ শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ শুধুমাত্র ভারত ভেঙে পাকিস্তানের জন্ম দেয়নি; এটি উপমহাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতিকে আমূল পরিবর্তন করেছিল। এই বৃহত্তর ইতিহাসের মধ্যে বঙ্গবিভাগের অভিজ্ঞতা ছিল বিশেষভাবে জটিল ও বেদনাবহ। ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাসে বঙ্গ ছিল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের কেন্দ্রস্থল। উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে যে নবজাগরণের সূচনা হয়, তা ভারতীয় সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে।

১৯৪১ সালের জনগণনা অনুসারে অবিভক্ত বঙ্গের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৪ শতাংশ মুসলমান এবং ৪২ শতাংশ হিন্দু ছিল। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জেলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, অন্যদিকে বঙ্গভূমির পশ্চিমাংশের বহু জেলায় হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দু জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল। অন্যদিকে ঢাকা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর বঙ্গের রাজনীতিতে মুসলিম লিগের প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মুসলিম লিগের অধিবেশনে গৃহীত 'লাহোর প্রস্তাব' ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই প্রস্তাবে ভারত ভেঙে মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলির জন্য পৃথক দেশ গঠনের কথা বলা হয়। পরবর্তীকালে এটিই পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তি হয়ে ওঠে।

'পাকিস্তান' পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মুসলিম লিগের দৃষ্টিতে 'বঙ্গ' ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্জাবের পাশাপাশি বঙ্গ ছিল এমন একটি বৃহৎ প্রদেশ যেখানে মুসলমানরা হয়ে ওঠে সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে সমগ্র বঙ্গকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা ছিল মুসলিম লিগের একটি স্বাভাবিক রাজনৈতিক লক্ষ্য। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে মুসলমান মহলে পাকিস্তান দাবির জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। কমিউনিস্টরা এই দাবিকে সমর্থন জানায়। ১৯৪৭ সালের দিকে এগোতে এগোতে বঙ্গের সামনে মূলত তিনটি বিকল্প স্পষ্ট হয়ে ওঠে— (১) সমগ্র বঙ্গ পাকিস্তানের অংশ হবে। (২) বঙ্গ একটি স্বাধীন, সার্বভৌম দেশ হবে। (৩) বঙ্গ বিভক্ত হবে এবং বঙ্গভূমির পশ্চিমাংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে। এই তিনটি বিকল্পকে কেন্দ্র করেই ১৯৪২-পরবর্তী রাজনৈতিক সংগ্রাম গড়ে ওঠে। এই প্রেক্ষাপটেই ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বঙ্গকে বিভক্ত করে বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড হিসেবে 'পশ্চিমবঙ্গ' সৃষ্টির পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর হিসেবে আবির্ভূত হন এবং সক্রিয় নেতৃত্ব প্রদান করেন।

ভারতীয় জাতীয় জীবনে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি একই সঙ্গে শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, প্রশাসক এবং রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত। ১৯০১ সালের ৬ জুলাই কলকাতার ভবানীপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবদন্তী উপাচার্য এবং বঙ্গীয় নবজাগরণের অন্যতম বিশিষ্ট

নদীয়ার ধুবুলিয়ায় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শনে শ্যামাপ্রসাদ (৭.৬.১৯৫০)

ব্যক্তিত্ব। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পন্ন করার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৯২৭ সালে তিনি ইংল্যান্ডে গিয়ে আইনশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন এবং লিঙ্কনস্ ইন থেকে ব্যারিস্টারি ডিগ্রি লাভ করেন। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে তাঁর নিয়োগ সেই সময়ে এক বিরল ঘটনা ছিল। ১৯২৯ সালে তিনি প্রথম বাঙ্গলার আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪১ সালে ফজলুল হকের মন্ত্রীসভায় তিনি অর্থমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ব্রিটিশ-ভারত সরকার স্পষ্ট বুঝতে পারে যে, ভারতে তাদের শাসনের অবসান ঘনিয়ে এসেছে। হিন্দু মহাসভা চেয়েছিল একটি ঐক্যবদ্ধ ভারত। অন্যদিকে মুসলিম লিগ পৃথক 'পাকিস্তান'-এর দাবিতে অনড় ছিল। বঙ্গ ছিল এই দ্বন্দ্বের একটি অন্যতম কেন্দ্র। ভারত বিভাগের ইতিহাসে ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন একটি যুগান্তকারী ঘটনা। মুসলিম লিগ ১৯৪৬ সালের নির্বাচনকে কার্যত পাকিস্তানের পক্ষে গণভোট হিসেবে উপস্থাপন করে। বঙ্গের মুসলমান-অধ্যুষিত আসনগুলির অধিকাংশ মুসলিম লিগ জয়লাভ করে। লিগের নেতারা দাবি করতে শুরু করেন যে, মুসলমানরা সমগ্র বঙ্গকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত দেখতে চায়।

এই ফলাফল বঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আমূল বদলে দেয়। নির্বাচনের ফলাফল হিন্দু মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত সমাজ এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করে। তাঁরা আশঙ্কা করতে শুরু করেন যে, স্বাধীনতার পরে সমগ্র বঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কলকাতার সংবাদপত্র, নাগরিক সংগঠন এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান এই প্রশ্নে উদ্বেগ প্রকাশ করতে থাকে। নির্বাচনের পর কলকাতার ভবিষ্যৎ নিয়ে বিতর্ক তীব্র হয়। কলকাতা ছিল ব্রিটিশ-ভারতের অন্যতম বৃহৎ শহর এবং পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক কেন্দ্র। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই প্রশ্নকে জনসমক্ষে জোরালোভাবে উত্থাপন করেন। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয় 'বেঙ্গল পার্টিশন লিগ', যা বঙ্গের বিভাজনের দাবিকে সুসংগঠিত রূপ দেয়। কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর-সহ বঙ্গভূমির পশ্চিমাংশের জেলাগুলিকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তিনি ব্যাপক প্রচার চালান। তাঁর মত ছিল এই যে, মুসলিম লিগের বিজয় বঙ্গের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি কঠোর বাস্তবতা তুলে ধরেছে। তিনি যুক্তি দেন যে, 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হলে হিন্দু সমাজ বঙ্গপ্রদেশে সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে এবং তাদের রাজনৈতিক নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে। তিনি বলেন, যদি উপাসনা-পদ্ধতির ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়, তবে বঙ্গপ্রদেশের হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলকে ভারতের বাইরে রাখা অন্যায় হবে। এই বক্তব্য পরবর্তীকালে বঙ্গবিভাগ আন্দোলনের মূল স্লোগানে পরিণত হয়।

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশ সরকারের 'ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা' ভেঙে পড়ার পর মুসলিম লিগ পৃথক পাকিস্তানের দাবিকে আরও তীব্র করে তোলে। লিগ সভাপতি মহম্মদ আলি জিন্না মুসলমানদের দাবি আদায়ের জন্য ১৬ আগস্ট ১৯৪৬-কে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেন। বঙ্গের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী (প্রিমিয়ার) হোসেন শহিদ সুরাবর্দি-র নেতৃত্বাধীন সরকার প্রশাসনকে অচল করতে ওই দিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করে। ১৬ আগস্ট সকালে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র জেহাদিরা ছড়িয়ে পড়ে ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কয়েকদিন ধরে চলতে থাকে হিন্দু নরসংহার, হিন্দু নারীদের বলাৎকার, অগ্নিসংযোগ, লুঠপাট ও প্রতিশোধমূলক হামলা। ইতিহাসবিদদের বিভিন্ন গবেষণায় স্বীকৃত যে, এই আক্রমণে কয়েক হাজার মানুষ প্রাণ হারান এবং কয়েক হাজার আহত হন। 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস্' নামে পরিচিত এই ঘটনা তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতিকে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

কলকাতার ঘটনার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি জেলায় জেহাদি হিংসার বিস্তার ঘটে। গ্রামের পর গ্রাম আক্রান্ত হয়। হিন্দু গণহত্যা, লুঠপাট, জোরপূর্বক ধর্মান্তরণ এবং ব্যাপক নারী নির্যাতনের অভিযোগ সামনে আসে। নোয়াখালির ঘটনাগুলি সমগ্র বঙ্গের হিন্দু সমাজকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই ঘটনাগুলিকে শুধুমাত্র সাময়িক ইসলামি সন্ত্রাস হিসেবে দেখেননি। তিনি যুক্তি দেন যে, যদি সমগ্র বঙ্গ পাকিস্তানের অংশ হয়, তাহলে হিন্দু জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে।

১৯৪৭ সালের প্রথমার্ধে বঙ্গের ভবিষ্যৎ নিয়ে একাধিক পরিকল্পনা সামনে আসে। এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ছিল জিন্নার নির্দেশে হোসেন শহিদ সুরাবর্দির উদ্যোগে 'United Bengal' বা 'স্বাধীন যুক্তবঙ্গ'-এর

পরিকল্পনা। মুসলিম লিগের কূটচালে প্রভাবিত হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণশঙ্কর রায়ের মতো বাঙ্গালি রাজনীতিক। সুরাবর্দির বক্তব্য ছিল, 'বঙ্গ' একটি স্বাধীন, সার্বভৌম দেশ হবে। ভারত ও পাকিস্তান— উভয়ের সঙ্গেই সম্পর্ক বজায় রাখবে। কিন্তু ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাবের অন্যতম প্রধান বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে, রাজনৈতিক বাস্তবতা উপেক্ষা করে কেবল আদর্শগত চিন্তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া বিপজ্জনক, কারণ এই পরিকল্পনা বঙ্গের হিন্দু সমাজের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তার পক্ষে অনুকূল নয়। তিনি যুক্তি দেন যে, মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বাধীন বঙ্গ শেষপর্যন্ত পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব-বলয়ে চলে যেতে পারে।

সংবাদপত্র, সভা, জনসমাবেশ এবং স্মারকলিপির মাধ্যমে স্বাধীন যুক্তবঙ্গের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী সমাজ এবং উদ্বিগ্ন হিন্দু জনগোষ্ঠীর একটি বড়ো অংশ তাঁর অবস্থানকে সমর্থন করতে শুরু করে। ক্রমশ 'যুক্তবঙ্গ' পরিকল্পনার গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পেতে থাকে। পরিবর্তে বঙ্গবিভাগ এবং বঙ্গপ্রদেশের হিন্দুপ্রধান পশ্চিমাংশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার পথই রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দৃঢ় বিরোধিতা এবং রাজনৈতিক প্রচারই 'পশ্চিমবঙ্গ' সৃষ্টির পথ সুগম করেছিল। শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন যে, হিন্দু সমাজের রাজনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পৃথক প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন। এই যুক্তিগুলিই বঙ্গভাগ আন্দোলনের মূল ভিত্তি হয়ে ওঠে। এই সময় কলকাতার বহু সংবাদপত্র বঙ্গের ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু করে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য ও প্রবন্ধগুলি নাগরিক সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর রাজনৈতিক প্রচারের মূল বার্তা ছিল— 'যদি পাকিস্তান গঠিত হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অংশ হতেই হবে।'

মুসলিম লিগের বহু নেতা বিশ্বাস করতেন যে, কলকাতা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে। এই কারণে কলকাতাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত রাখার দাবি বিভিন্ন সময়ে উত্থাপিত হয়। এটি বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের মধ্যে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করে। শ্যামাপ্রসাদ কয়েকটি মৌলিক যুক্তি তুলে ধরেন। কলকাতার শিল্প, বন্দর ও আর্থিক কাঠামো ভারতের বৃহত্তর অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। বঙ্গীয় নবজাগরণ, সাহিত্য, শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল কলকাতা। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হিন্দু জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য ছিল। ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আন্দোলনের ফলে অবশেষে কলকাতা-সহ শিল্পাঞ্চল হাওড়া, আসানসোল, দুর্গাপুর এবং উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চল ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। আজকের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের ভিত্তি সেদিনের এই সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ১৯৪৭ সালের শুরুতে ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, ভারতে তাদের শাসনের অবসান ঘটাতে হবে। ব্রিটিশ-ভারত সরকারের নতুন ভাইসরয় হিসেবে নিযুক্ত হন লুই মাউন্টব্যাটেন। তাঁর প্রধান দায়িত্ব ছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের রূপরেখা চূড়ান্ত করা। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সহযোগীরা ব্রিটিশ-ভারত সরকারের কাছে ধারাবাহিকভাবে স্মারকলিপি জমা দেন। এই বিষয়ে তিনি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, বিশেষত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেন।

বঙ্গীয় আইনসভায় ভোটাভুটি, সীমানা নির্ধারণ এবং প্রশাসনিক প্রস্তুতির মাধ্যমে 'পশ্চিমবঙ্গ' গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। '২০ জুন, ১৯৪৭'-এর ভোটাভুটি সেই সিদ্ধান্তের অন্যতম প্রধান ধাপ। এই ভোটের ফলাফলই 'পশ্চিমবঙ্গ' সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করে। ভোটাভুটির পর সীমান্ত নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয় র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বাধীন বাউন্ডারি কমিশনকে। স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে কমিশন নতুন সীমারেখা নির্ধারণ করে। অবশেষে স্বাধীন ভারতের মানচিত্রে 'পশ্চিমবঙ্গ'-এর আবির্ভাবের পথ সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হয়। নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়— কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর, নদীয়ার অংশবিশেষ, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং-সহ অন্যান্য অঞ্চল। ২০ জুন, ১৯৪৭-এর সিদ্ধান্ত বাঙ্গলা তথা ভারতের ইতিহাসে এক মোড় পরিবর্তনকারী, যুগান্তকারী ঘটনা। এইভাবেই ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত রাজনৈতিক সংগ্রাম একটি বাস্তব রাজনৈতিক ফলাফলে পরিণত হয়, যা ইতিহাসে ভারতের অন্তর্ভুক্ত 'পশ্চিমবঙ্গ' নামক রাজ্যটির সৃষ্টি। ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭-এ স্বাধীন ভারতের মানচিত্রে একটি নতুন অঙ্গরাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে 'পশ্চিমবঙ্গ'।

১৯৪৭ সালের পর থেকেই জেহাদিদের দ্বারা প্রবল হিন্দু নির্যাতনের ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমন শুরু হয়। ১৯৫০ সালে বরিশালে হিন্দু নরসংহার, পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে হিন্দু নিরাপত্তা বিষয়ক উদ্বেগ এই প্রবাহকে আরও বাড়িয়ে দেয়। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মনে করতেন যে, উদ্বাস্তু সমস্যা কেবল একটি প্রাদেশিক সমস্যা নয়, এটি একটি জাতীয় সমস্যা। যাঁরা দেশভাগের ফলে নিজেদের বাড়িঘর, ভিটেমাটি সর্বস্ব হারিয়েছেন, তাঁদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব সরকারের। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার বিষয়েও সরব ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ। ১৯৫০ সালের নেহরু-লিয়াকত চুক্তি নিয়ে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আপত্তি ছিল। এই মতপার্থক্য পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে তাঁর পদত্যাগের অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে।

১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। এর ঠিক আট বছর পর ১৯৫১ সালের ২১ অক্টোবর 'ভারতীয় জনসঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পরবর্তীকালে যার আদর্শগত উত্তরসূরী হিসেবে পরিচিত হয় ভারতীয় জনতা পার্টি। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তি ছিল সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধ, জাতীয় ঐক্য ও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য রক্ষা।

ইতিহাসে কিছু ব্যক্তিত্ব আছেন যাঁদের অবদান তাঁদের জীবদ্দশার সীমা অতিক্রম করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনকে প্রভাবিত করে। ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই একজন। তিনি 'পশ্চিমবঙ্গ'-এর অন্যতম প্রধান স্থপতি এবং হিন্দু বাঙ্গালির অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামের অগ্রদূত। 'পশ্চিমবঙ্গ' সৃষ্টি শুধুমাত্র একটি নতুন রাজ্যের সৃষ্টি ছিল না। এটি ছিল লক্ষ লক্ষ হিন্দু বাঙ্গালির নিরাপদ আবাসভূমি, উদ্বাস্তু হিন্দুর আশ্রয়স্থল, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় অর্থনীতির ভিত্তি এবং স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক কাঠামোর একটি অপরিহার্য অংশ।

'পশ্চিমবঙ্গ' প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান স্থপতি এবং হিন্দু বাঙ্গালির অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় নায়ক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। 'পশ্চিমবঙ্গ'-এর জন্মের ইতিহাস যতদিন আলোচিত হবে, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা ততদিন পঠনপাঠন, গবেষণা ও শ্রদ্ধার বিষয় হয়ে থাকবে।

(লেখক বঙ্গবাসী সান্ধ্য কলেজের ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ)

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির শিক্ষা-দর্শন

বিকশিত ভারতের ভিত্তি

কিশোর বর্মন

কোনো জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় তার শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে। শিক্ষা কেবল জ্ঞান অর্জনের উপায় নয়; এটি একটি জাতির সংস্কৃতি, সভ্যতা, মূল্যবোধ, আত্মপরিচয় ও রাষ্ট্রচিন্তার প্রধান বাহক। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যখন ভারত বিশ্বসভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন তার মূল শক্তি ছিল শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা। সেই কারণেই ভারতকে প্রাচীনকাল থেকেই 'বিশ্বগুরু' হিসেবে অভিহিত করা হতো।

আজ যখন ভারত ২০৪৭ সালের 'বিকশিত ভারত' গঠনের লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে— কেমন শিক্ষাব্যবস্থায় সেই ভারত নির্মাণ হবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের ফিরে দেখতে হবে প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-ঐতিহ্য, ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির প্রভাব, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির শিক্ষা-চিন্তা এবং বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-কে।

প্রাচীন ভারত শুধু একটি ভৌগোলিক ভূখণ্ড ছিল না; এটি ছিল জ্ঞান, দর্শন, বিজ্ঞান এবং মানবিক মূল্যবোধের এক মহাসমুদ্র। গণিতে শূন্যের আবিষ্কার, দশমিক পদ্ধতির বিকাশ, জ্যোতির্বিদ্যায় আর্যভট্টের অবদান চিকিৎসাবিজ্ঞানে চরক ও সুশ্রুতের গবেষণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং দর্শনে উপনিষদের অমূল্য শিক্ষা— সব মিলিয়ে ভারত ছিল বিশ্বের অন্যতম অগ্রগণ্য জ্ঞানসভ্যতা।

তক্ষশিলা ছিল প্রাচীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র। বহু ঐতিহাসিকের মতে, খ্রিস্টপূর্ব যুগ থেকেই এটি আন্তর্জাতিক শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। ভারতবর্ষের পাশাপাশি ব্যাবিলন, সিরিয়া, মিশর, গ্রিস, চীন ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে বিদ্যা অর্জনের জন্য আসতেন।

চিকিৎসাবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সামরিক বিদ্যা, দর্শন, ব্যাকরণ, জ্যোতির্বিজ্ঞান- সহ প্রায় ৬০টিরও বেশি বিষয় এখানে পড়ানো হতো। চাণক্য, জীবক ও পাণিনির মতো বিদ্বানদের নাম এই শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

পঞ্চম শতকে প্রতিষ্ঠিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের প্রথম বৃহৎ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যতম ছিল। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এবং ই-চিং তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্তে নালন্দার বিশালতা ও শিক্ষার উৎকর্ষের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

তাঁদের বিবরণ অনুযায়ী, নালন্দায় প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থী এবং ২ হাজার শিক্ষক অধ্যয়ন ও গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। এখানে বৌদ্ধ দর্শনের পাশাপাশি বেদ, ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিত, ভাষাতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ানো হতো। নালন্দার গ্রন্থাগার 'ধর্মগঞ্জ' ছিল প্রাচীন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জ্ঞানভাণ্ডার, যেখানে অসংখ্য দুর্লভ পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল।

নালন্দার পাশাপাশি বিক্রমশীলা, বল্লভী ও ওদন্তপুরীর মতো বিশ্ববিদ্যালয়ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিল। এগুলো ছিল তৎকালীন বিশ্বের জ্ঞানচর্চার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল—

১. **চরিত্র গঠন :** শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল সৎ, আদর্শবান ও চরিত্রবান মানুষ তৈরি করা।

২. **মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তি :** মাতৃভাষা ও সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা হতো।

৩. **জীবনমুখী শিক্ষা :** কৃষি, কারুশিল্প, চিকিৎসা, যুদ্ধবিদ্যা ও প্রশাসন-সহ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হতো।

৪. **শিক্ষক-শিষ্য সম্পর্ক :** গুরুকুল ব্যবস্থায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে গভীর মানবিক ও আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠত।

৫. **জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় :** বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতাকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে দেখা হতো। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার মূল মন্ত্র ছিল— 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে', অর্থাৎ যে শিক্ষা মানুষকে মুক্ত করে, সেটিই প্রকৃত শিক্ষা।

গুরুকুল ব্যবস্থায় শিক্ষা কেবল পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং নৈতিকতা, কর্তব্যবোধ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সমাজচেতনা, পরিবেশ সচেতনতা ও জীবনদর্শনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো।

পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ এই দর্শনকে নতুন ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন— 'Education is the manifestation of the perfection already in man.' অর্থাৎ শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশ ঘটায়।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভারতের এই সমৃদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা পরবর্তী সময়ে বহিরাগত আক্রমণ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজির আক্রমণে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত। বলা হয়, নালন্দার বিশাল গ্রন্থাগারে দীর্ঘ সময় ধরে আগুন জ্বলেছিল। এর ফলে অসংখ্য পাণ্ডুলিপি, গবেষণালব্ধ জ্ঞান এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার বিনষ্ট হয়।

যদিও ভারতের জ্ঞান-ঐতিহ্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি, তবুও ধারাবাহিক আক্রমণ, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বহু গুরুকুল, টোল, মঠ ও শিক্ষাকেন্দ্র ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। শিক্ষার ধারাবাহিকতাও ব্যাহত হয়।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষাব্যবস্থায় এক মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়। ১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি টমাস ব্যাবিংটন মেকলে তাঁর বিখ্যাত Minute on Education-এ লিখেছিলেন যে এমন একটি শ্রেণী তৈরি করতে হবে যারা—

'Indian in blood and colour. but English in taste, in morals and in intellect.' অর্থাৎ রক্তে ও বর্ণে ভারতীয় হলেও চিন্তা, রুচি, মতাদর্শ ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ।

এই লক্ষ্যেই ভারতীয় জ্ঞান-পরম্পরাকে উপেক্ষা করে ইংরেজিভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রসার ঘটানো হয়। সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্তে ইংরেজি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

তবে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য— মেকলের নামে প্রচলিত কিছু দীর্ঘ বক্তৃতা বা উদ্ধৃতি ইতিহাসবিদদের মতে অপ্রমাণিত বা ভুয়া। তাই ইতিহাস বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁর প্রামাণ্য Minute on Indian Education-কেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

মেকলের শিক্ষানীতির ফলে— ভারতীয় ভাষা ও জ্ঞানচর্চা উপেক্ষিত হয়। ● চাকরিমুখী শিক্ষার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ● প্রশাসনিক কর্মচারী তৈরির ধারা জোরদার হয়। ● ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস দুর্বল হয়। ● শিক্ষা ও সমাজের স্বাভাবিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে একই সঙ্গে ইংরেজি ভাষা ভারতীয়দের জন্য বিশ্বজ্ঞান, আধুনিক বিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের নতুন দ্বারও উন্মুক্ত করে। তাই এই বিষয়টিকে একমাত্রিক নয়, বরং বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

স্বাধীনতার পর একটি আধুনিক, বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে কিছু মৌলিক সমস্যা রয়ে যায়—

● মুখস্থনির্ভর শিক্ষা। ● গবেষণার সীমাবদ্ধতা। ● দক্ষতা উন্নয়নের ঘাটতি। ● ভারতীয় জ্ঞান-ঐতিহ্যের সীমিত উপস্থিতি। ● মাতৃভাষার পর্যাপ্ত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারত প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ছিলেন স্বাধীন ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ, রাষ্ট্রনায়ক ও দূরদর্শী চিন্তাবিদ। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যা আজও এক বিরল কৃতিত্ব। তিনি বিশ্বাস করতেন— 'শিক্ষা এমন হতে হবে, যা জাতীয় চেতনা জাগ্রত করবে এবং চরিত্রবান নাগরিক গড়ে তুলবে।'

তাঁর মতে শিক্ষা হওয়া উচিত--- ● জাতীয়তাবোধসম্পন্ন, ● চরিত্রনির্মাণমূলক, ● বিজ্ঞানমনস্ক, ● আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর এবং ● ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত। তিনি মনে করতেন, শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যা জাতিকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে এবং জাতীয় পুনর্জাগরণের পথ সুগম করবে। ভারতীয় ঐতিহ্য ও আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয়ের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বর্তমান সময়ে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ স্বাধীন ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা সংস্কার হিসেবে বিবেচিত হয়। এই নীতিতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির শিক্ষা-চিন্তার প্রতিফলন স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।

এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

১. **মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা :** প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষায় শিক্ষাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২. **ভারতীয় জ্ঞান-পরম্পরার পুনঃপ্রতিষ্ঠা :** ভারতীয় দর্শন, গণিত, ভাষা, যোগ, আয়ুর্বেদ এবং ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানব্যবস্থাকে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

৩. **বহুমাত্রিক ও আন্তঃবিভাগীয় শিক্ষা :** বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্যের কৃত্রিম বিভাজন দূর করে শিক্ষার্থীদের বহুমুখী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

৪. **দক্ষতা ও কর্মমুখী শিক্ষা :** ষষ্ঠশ্রেণী থেকেই কারিগরি ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫. **গবেষণা ও উদ্ভাবন :** ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে গবেষণা ও উদ্ভাবনকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

সুতরাং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির শিক্ষা-দর্শন ও NEP-2020; একটি স্বাভাবিক সেতুবন্ধন তাঁর শিক্ষা-চিন্তা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই—

● মাতৃভাষার গুরুত্ব, ● জাতীয় চেতনার বিকাশ, ● চরিত্র গঠন, ● বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার, ● গবেষণা ও উদ্ভাবন, ● এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। এই প্রতিটি উপাদানই জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর বিভিন্ন স্তরে প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ, আধুনিক প্রযুক্তি ও বিশ্বমানের শিক্ষার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার আত্মাকে যুক্ত করার যে স্বপ্ন ড. মুখার্জি দেখেছিলেন, NEP-2020 সেই স্বপ্নেরই এক আধুনিক ও বাস্তবসম্মত রূপ।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ভারতকে বিশ্বগুরুর মর্যাদা এনে দিয়েছিল। বৈদেশিক আক্রমণ, ঔপনিবেশিক নীতি এবং দীর্ঘদিনের অবহেলায় সেই গৌরব অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু ইতিহাসের ধারা কখনো থেমে থাকে না। আজ ভারত আবার শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাসকে ভিত্তি করে নতুন যাত্রা শুরু করেছে। ২০৪৭ সালের বিকশিত ভারত গঠনের জন্য প্রয়োজন এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা, যা একদিকে বিশ্বমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে গ্রহণ করবে, অন্যদিকে ভারতীয় সভ্যতার শিকড়ের সঙ্গে দৃঢ় সংযোগ বজায় রাখবে।

প্রাচীন নালন্দা ও তক্ষশিলার জ্ঞান-ঐতিহ্য, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জাতীয় শিক্ষা-দর্শন এবং জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০-এর সংস্কারমূলক উদ্যোগ— এই তিনের সমন্বয়ই গড়ে তুলতে পারে এক আত্মবিশ্বাসী, জ্ঞানসমৃদ্ধ উদ্ভাবনী ও বিকশিত ভারত, যে ভারত আবারও বিশ্বের কাছে জ্ঞান, মূল্যবোধ ও মানবকল্যাণের পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

[লেখক মন্ত্রী, উচ্চশিক্ষা, পঞ্চায়েত, সাধারণ প্রশাসন (রাজনৈতিক দপ্তর), ত্রিপুরা সরকার]

রবীন্দ্রনাথ—চিরনির্ভর শ্যামাপ্রসাদ

অমিত দাশ

আদর্শগতভাবে ইংরেজ সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি একান্ত অনীহা থেকেই রবীন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু উদ্যোক্তাদের অনেকের ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তে দেশীয় মোড়কে প্রায় একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি সবিশেষ আগ্রহ, শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি (যা রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন) সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাব এবং কলহপরায়ণতায় যারপরনাই বিরক্ত হয়ে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন। 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের 'বিদায়' কবিতায় লিখেছেন—

'বিদায় দেহো, ক্ষম আমায় ভাই।
কাজের পথে আমি তো আর নাই।
এগিয়ে সবে যাও-না দলে দলে,
জয়মাল্য লও-না তুলি গলে,
আমি এখন বনচ্ছায়াতলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই।
তোমরা মোরে ডাক দিয়ো না ভাই।'

স্বভাবতই শান্তিনিকেতনে স্বপ্নের (ভারতবর্ষের প্রাচীন তপোবনের আদর্শে) শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে মনপ্রাণ ঢেলে দিতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। অথচ কিছুদিনের মধ্যেই একই ইংরেজ সরকার নিয়ন্ত্রিত সরকারি শিক্ষার পীঠস্থান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে দীর্ঘ যোগাযোগ তথা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তার মূলে ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর পুত্র শ্যামাপ্রসাদ—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকালের দুই শ্রেষ্ঠ উপাচার্য।

স্মরণযোগ্য, নোবেল পুরস্কার ঘোষণা হবার আগেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সাম্মানিক 'ডক্টরেট' উপাধি প্রদানের যে প্রস্তাব গ্রহণ করে জাতিকে লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করেছিল—তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলমন্ত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্বাচন করেছিলেন বেদমন্ত্র (যজুর্বেদ) 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' অর্থাৎ সমগ্রবিশ্ব এসে নীড় খুঁজে নেবে এই বিশ্বভারতীতে। বস্তুত, ভারতবর্ষ চিরকাল যে মহানমন্ত্র 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'কে আশ্রয় করেছে বিশ্বভারতী সেই মন্ত্রকে সাকার করতে চাইলো।

দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট পণ্ডিত ও অধ্যাপকদের আমন্ত্রণ জানাতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথ। ফরাসি পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভিকে আমন্ত্রণ জানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে এগিয়ে এল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। দৌত্য ছিল তরুণ শ্যামাপ্রসাদের।

১৯২২ সালে শ্যামাপ্রসাদের পিতামহীর নামাঙ্কিত 'জগত্তারিণী' পদক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হতে প্রদান করা হয় রবীন্দ্রনাথকে। উল্লেখ্য তিনিই এই পদকের প্রথম প্রাপক।

বর্তমান বছরেই রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রিয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পৌত্রী সুধাদেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন শ্যামাপ্রসাদ। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা পরলোকগতা মাধুরীলতার স্বামী ছিলেন বিহারীলালের এক পুত্র শরৎকুমার।

সরকারিভাবে স্বীকৃত না থাকায় শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্ররা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসবার সুযোগ পেয়েছেন আশুতোষেরই চেষ্টায়।

এক সময় এই সুযোগ বন্ধ হয়ে গেলে শ্যামাপ্রসাদের উদ্যোগে পুনরায় তা চালু হয়েছে। উল্লেখ্য, সুযোগ বন্ধ হয়েছিল চার্লস ফ্রিয়র অ্যান্ড্রুজের কারণে এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন বিদেশে। বিদেশ থেকে ফিরলে শ্যামাপ্রসাদের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। পূর্ব ব্যবস্থা ফিরে আসে। শুধুমাত্র এন্ট্রান্স পরীক্ষা মাত্র নয়, বিশ্বভারতী সংসদের প্রস্তাবে জানা যায় যোগাযোগ আরও বিস্তৃত ছিল, সংসদের ১৯২৫ সালের ১১ জুলাই প্রস্তাবটি নিম্নরূপ :

Regular Students of Santiniketan Siksha-Bhavan who have abtained the Madhya and Upadhi; certificate of Visva-Bharati Shall be permited, if they so desire, to sit for respectively the I.A. and B.A Examination of the Calcutta University in the following subjects.

উল্লেখ্য, বিষয় তালিকায় বাংলা, অঙ্ক, ইংরাজি, ইতিহাস, জীববিদ্যার সঙ্গে সংস্কৃত, হিন্দি, পালি, ফরাসি ও উর্দু ভাষাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শ্যামাপ্রসাদ তখন উপাচার্য না হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। প্রসঙ্গত, ১৯২৪ সালের ২৫ মে আশুতোষ মুখোপাধায়ের প্রয়াণ ঘটে— রবীন্দ্রনাথ তখন বিদেশে।

প্রথমাবধি শিক্ষা সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদের আগ্রহের বিষয়টি জানা ছিল বলে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রালাপ রবীন্দ্রনাথ শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গেই করতেন। ২২ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ সালে শ্যামাপ্রসাদকে লেখা রবীন্দ্রপত্রটি উদ্ধারযোগ্য।

ফঃ ৩

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— ''কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কিছু লেখবার সময় পাইনি— শীঘ্র যে পাব এমন আশা করিনে। অথচ যখন প্রতিশ্রুতিদ্বারা বদ্ধ আদি তখন ফাঁকি দেওয়া চলবে না। অতএব যদি না লিখে মুখে মুখে কিছু বললে নিয়মবিরুদ্ধ না হয় তাহলে চীন যাবার আগে একটা বক্তৃতা দিয়ে যেতে পারি। মার্চমাসের মাঝামাঝি আমাকে ছাড়তে হবে। আমাকে আগামী ২৩ তারিখে ডাক্তার গোপাল চাটুয্যের একটি সভায় সভাপতির কাজ করতে যেতে হবে। সেই সময়ে যদি দেখা করতে পার তাহলে সব কথা আলোচনা হতে পারবে। চীনে যাবার আগে তোমার বাবার সঙ্গে একবার কোনো সুযোগে দেখা করে যেতে চাই— কী উপায়ে হতে পারবে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করা যাবে।''

ইতিমধ্যেই শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের সেতু তৈরি হয়েছিল শ্যামাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রমাপ্রসাদের অর্থানকূল্যে, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'বঙ্গবাণী' পত্রিকা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র-সহ বিশিষ্ট সাহিত্যিকারদের রচনা সংগ্রহের দায়িত্ব ছিল মূলত শ্যামাপ্রসাদের।

'বঙ্গবাণী' পত্রিকাসূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের যোগাযোগ-সংক্রান্ত পূর্বোল্লিখিত প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ রয়েছে। বর্তমান সংকলন গ্রন্থের সীমিত পরিসরের কথা ভেবে আলোচনায় কিছু পরিমাণে উল্লম্ফন নীতি অপরিহার্য হলেও বলা প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য রচনা 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত হয়েছে এবং সেসকল রচনার অনেকগুলিই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত, অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের অনুমতি না নিয়েও 'বঙ্গবাণী'র বিশেষ-সংখ্যায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হবে জানিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ায় বিরক্তির ছাপ ছিল না, বরং কিছু পরিমাণে কৌতুক-মিশ্রিত প্রশ্রয়ের মনোভাব দুর্লক্ষ্য থাকেনি।

৪ঠা আশ্বিন, ১৩৩০ বঙ্গাব্দে লেডি রাণু মুখার্জিকে পত্রে লিখেছেন— ''বঙ্গবাণী নামক এক মাসিকপত্র আমার সম্মতি না নিয়েই বিজ্ঞাপন দিয়েছে যে আশ্বিনের বঙ্গবাণীতে আমার কবিতা বেরোবে। পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র বনে গিয়েছিলেন সেই ত্রেতাযুগে, সম্পাদকের সত্য (প্রকৃতপক্ষে শ্যামাপ্রসাদের— লেখক) পালনের জন্য কবিতা লিখতে হয় এই কলিযুগে। আজই লিখে না দিলে চলবে না।''

লেখনীতে কবিতা দেখা দিচ্ছে না দেখে শ্যামাপ্রসাদকে পত্রে লিখেছেন— '...কবিতা বুনো পাখি, তাকে 'আয়' বলে ডাকলেই ধরা দেয় না। তার বদলে 'সমস্যা' নামক একটি গদ্য-প্রবন্ধ লিখতে বসলাম। এটাতে তোমাদের পাঠকমহলে উত্তেজনা হবে। পদ্যের শীতলভোগের চেয়ে সেটা বর্তমান কালের উপযোগী হতে পারবে বলে আশা করি।' উল্লেখ্য 'সমস্যা' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক' বিষয়ক বহু স্পষ্ট কথার আকর— তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা এই প্রবন্ধে প্রায়শ রবীন্দ্রনাথের ভাবনাতেও হিন্দু সাম্প্রদায়িক মনোভাব সন্ধান করবার অবকাশ খুঁজতে চেয়েছেন। প্রবন্ধটি রচনাকালেই 'যাত্রা' (পূরবী) নামের একটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে সৃষ্টি হলে কবিতাটি তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গবাণী'তে। ভালো ভাবে সংশোধন করা হয়নি ভেবে পরেরদিন পাঠালেন কবিতার সংশোধিত পাঠ। সমগ্র ঘটনাবলীতে শ্যামাপ্রসাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অপার স্নেহের স্বরূপটি প্রকাশিত— সে কথা বলাই বাহুল্য।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তিনটি বক্তৃতার অনুলিখন রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পুনর্লিখিত হয়ে 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত Indian Philosophical Congress প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, প্রবন্ধ 'সমবায়নীতি', গান 'তোমার বীণায় গান ছিল', 'লিপিকা'র গদ্য কবিতা, শিশু ভোলানাথ কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতা-সহ অসংখ্য রবীন্দ্ররচনা 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত হয়েছে শ্যামাপ্রসাদের আগ্রহে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের এত বেশি রচনা প্রকাশের সৌভাগ্য ঘটেছে খুব কম পত্রপত্রিকার।

শুধুমাত্র কাজের যোগাযোগ নয়, ব্যক্তিগত দুঃখ, সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে ভাবনার বিনিময় করেছেন রবীন্দ্রনাথ ও শ্যামাপ্রসাদ। ১৯৩৩ সালে শ্যামাপ্রসাদের স্ত্রী সুধাদেবীর মৃত্যু হলে রবীন্দ্রনাথ শ্যামাপ্রসাদকে এক পত্রে লেখেন— ''তোমার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদে ব্যথিত হয়েছি। তোমার বলিষ্ঠ চিত্ত, এই দুঃসহ শোককে উত্তীর্ণ হয়েও সান্ত্বনা পাবে সন্দেহ নেই। জীবনের সর্ব্বপ্রধান অভিজ্ঞতা মৃত্যুতে, সেই মৃত্যু যখন নিকটতম আত্মীয়ের ঘটে, তখন অন্তরের গভীরতম কক্ষ উদ্‌ঘাটিত হয় তার আঘাতে। সেইখান থেকে তুমি সেই বৈরাগ্যের বাণীকে লাভ করো যা ইহলোক ও পরলোকের মাঝখানে দৌত্যসাধন করে এই কামনা করি।''

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নিঃসংকোচে শ্যামাপ্রসাদের সাহায্য চাইবার মতো সম্পর্ক ছিল রবীন্দ্রনাথের। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (মীরাদেবীর স্বামী) জন্য বিশ্ববিদালয়ের আবাসন মঞ্জুর করবার অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখেছেন (১০ জানুয়ারি, ১৯২৬) শ্যামাপ্রসাদকে। নিছক একজন সিন্ডিকেট সদস্য শ্যামাপ্রসাদের পক্ষে কবির অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আবাসন ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে শ্যামাপ্রসাদেরই দৌত্যে।

শ্যামাপ্রসাদের অপারগতায় তাঁর সঙ্গে কবির সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আঁচ লাগেনি— দু'জনে দু'জনের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে যথার্থই ওয়াকিবহাল ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে শ্যামাপ্রসাদের কার্যকাল (১৯৩৪-১৯৩৮) রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে স্বর্ণোজ্জ্বল পর্ব। শ্যামাপ্রসাদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে গীত হবার জন্য গান রচনা করেন। প্রথমে 'শুভ কর্মপথে' ও পরে 'চলো যাই, চলো যাই' গান দুটি রচিত হলে দ্বিতীয়টিই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে গৃহীত হয়। প্রথম গানটি গৃহীত না হবার সম্ভাব্য কারণ খুঁজতে মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি বড়ো অংশের ভূমিকা বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখলেও বক্ষ্যমান প্রবন্ধে সঙ্গত কারণেই তা সম্ভব হতে পারে না।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে শ্যামাপ্রসাদের গভীর আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ ৮০ বছরের ইতিহাসে প্রথম, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং বেসরকারি কোনো ব্যক্তি সমাবর্তনে পৌরোহিত্য করলেন। সিনেট হলে স্থান সংকুলান হবে না জেনে প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাঙ্গণে তৈরি হলো বিশেষ মণ্ডপ। যা অসম্ভব জানা ছিল, তাই হলো— রবীন্দ্রনাথ বাংলাতে সমাবর্তন ভাষণ প্রদান করলেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন— 'এই অঘটন ঘটাইবার কৃতিত্ব তৎকালীন ভাইসচেন্সিলার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্মানিক অধ্যাপক পদে রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান জানানো হলে তা নিয়েও বহু বিতর্ক উঠেছে। সরকারি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের পদগ্রহণ বিষয়ে সাময়িকভাবে বন্ধুবিচ্ছেদের পরিস্থিতি কিংবা ভুলবোঝাবুঝির অবকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথও বিচলিত হয়ে শ্যামাপ্রসাদকেই সমাধানের পথ খোঁজার অনুরোধ জানিয়ে ১৯৩২ সালের ২১ জানুয়ারির পত্রে লিখেছেন— '...বুঝতে পারছি কঠিন প্রতিকূল দৃষ্টির সামনে আমাকে কাজ করতে হবে, পদে পদে অশান্তি ঘটবে— এমনতর অবস্থায় নিজের যোগ্যতা সপ্রমাণ করাও দুঃসাধ্য হবে। অতএব কী উপায়ে আমার শান্তি ও সম্মান যথোচিতভাবে রক্ষা হতে পারে সেকথা তোমাকেও আমার প্রতি মমতা রক্ষা করে চিন্তা করতে হবে। ...কী করা কর্তব্য যথার্থ বন্ধুভাবে সেকথা চিন্তা করো, পরামর্শ দিয়ো।... শ্যামাপ্রসাদের ওপর কবির নির্ভরতা প্রকাশ পেয়েছে উল্লিখিত পত্রের ছত্রে ছত্রে— যা ছিল যথার্থই সঙ্গত আশা।

বিশশতকের গোড়াতে, বিশেষত প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই সমস্ত বিশ্বে শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের যে ভাবনা দেখা দেয়, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আন্তর্জাতিক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'New Education Fellowship'-এর ভারতীয় শাখা 'নবশিক্ষা সঙ্ঘ'-এর অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব উল্লেখ করেন। বঙ্গের মুসলিম লিগের সরকার রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব অনুমোদন ও গ্রহণ না করলেও শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবিষয়ে এগিয়ে আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায় রবীন্দ্রনাথের 'বাংলাভাষা পরিচয়' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্যামাপ্রসাদের কার্যকাল সমাপ্ত হলে উদ্যোগটি আর বিশেষ অগ্রসর হয়নি।

শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক আদর্শ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব ব্যক্ত হয়নি, অবকাশও ছিল না, কারণ রাজনৈতিক জগতে শ্যামাপ্রসাদের পদার্পণের সূচনালগ্নেই প্রয়াণ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের। যাদের জন্য রাজনীতি সেই মানুষ সম্পর্কে ভাবনায় শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন যথার্থই রবীন্দ্রানুসারী। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নয়— মানুষের পরিচয়ই শ্যামাপ্রসাদের কাছে গুরুত্ব পেয়েছে সর্বাধিক। তাঁকে লেখা বঙ্গের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মুসলমান কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের শেষতম পত্রটি পড়লে শ্যামাপ্রসাদকে যারা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন বলেছেন, তাদের বোধ-বুদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে বাধ্য। আর একজন বিখ্যাত মুসলমান, যিনি এমনকী পাকিস্তান প্রস্তাবের উত্থাপক, সেই ফজলুল হক শ্যামাপ্রসাদের রহস্যজনক মৃত্যুতে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন তাও উল্লেখযোগ্য।

বস্তুত, হিন্দুর শক্তিহীনতা, ঐক্যের অভাব ইত্যাদি যে সকল বিষয়ে তাঁর মনোভাবের সঙ্গে সামান্যতম তফাত ছিল না রবীন্দ্রনাথের। 'কালান্তর'-এ 'স্বামী শ্রদ্ধানন্দ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— ''যদি মুসলমান মারে আমরা পড়ে পড়ে মার খাই তবে জানব, এ সম্ভব করেছে শুধু আমাদের দুর্বলতা... আমাদের নিজেদের দুর্বলতা দূর করতে হবে। আমরা প্রতিবেশীদের কাছে আপিল করতে পারি 'তোমরা ক্রূর হোয়ো না, তোমরা ভালো হও, নরহত্যার উপর কোনো ধর্মের ভিত্তি হতে পারে না'— কিন্তু সে আপিল দুর্বলের কান্না। বায়ুমণ্ডলে বাতাস লঘু হয়ে এলে ঝড় যেমন আপনিই আসে, ধর্মের দোহাই দিয়ে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না, তেমনি দুর্বলতা পুষে রেখে দিলে সেখানে অত্যাচার আপনিই আসে— কেউ বাধা দিতে পারে না, কিছুক্ষণের জন্য হয়তো একটা উপলক্ষ্য নিয়ে পরস্পর কৃত্রিম বন্ধুত্বতার বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি, কিন্তু চিরকালের জন্য তা হয় না।"

শ্যামাপ্রসাদের ভাবনা ছিল হিন্দুর সংহতি— অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহের মতো হিন্দুরও সংগঠিত হবার স্বাধীনতা থাকা উচিত, সে বিষয়ে কোনো দ্বিধা ছিল না তাঁর। তিনি হিন্দুর ঐক্যের যে আদর্শে বিশ্বাস করতেন, তা রবীন্দ্রভাবনারই অনুরণন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ৭ সেপ্টেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এক সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীন ভাষায় বলেছেন— ''মুসলমানের যে স্বাধীনতায় আমরা বাধা দিই না সে স্বাধীনতা আমাদেরও প্রাপ্য। তাহারা নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে, তাহারা ইচ্ছামতো হিন্দুকে মুসলমানে দীক্ষিত করিতে পারে আর তাহা করেছে এবং করিয়াছে— আমরা তো কখনো বাধা দিতে দাঁড়াই না। আমরা যখন দিয়েছি, তখন তাহারাই-বা সে স্বাধীনতা কেন আমাদের দেবে না? আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে চাহিলে তাহারা কেন তাহাতে বাধা দেবে?"

১৯৪১ সালের ৮ আগস্ট প্রয়াণ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের। পুষ্পার্ঘ প্রদানের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে অন্তিম শ্রদ্ধা জানিয়েছেন শ্যামাপ্রসাদ বহু ইতিহাসের সাক্ষী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলের সামনে দাঁড়িয়ে। নিমতলা ঘাটেও পৌঁছেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ, সর্বজ্ঞাত— 'রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ' শ্লোকটিকে সত্য প্রমাণিত করে।

সংযোজন

অসংখ্য মানুষের বিভিন্ন ধরনের উপরোধ আসতো কবির কাছে। না-করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু যাঁকে উপরোধ করে রবীন্দ্রনাথ পত্র লিখলেন তাঁরও কিছু বাস্তব অসুবিধা থাকতে পারে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন কবি।

শ্যামাপ্রসাদকে উদ্দেশ্য করেও অজস্র সংগত-অসংগত উপরোধপত্র লিখতে হতো রবীন্দ্রনাথকে। শ্যামাপ্রসাদের প্রতি অগাধ আস্থা ছিল কবির— তাঁকে একান্তই আপনার জন বলে মনে করতেন। নিম্নোক্ত পত্রটি তারই এক অনবদ্য সাম্য বহন করছে।

ওঁ

জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়েষু,

মাঝে মাঝে নিতান্ত দায়ে পড়ে তোমাকে উপরোধপত্র দিতে হয়, তুমি তার প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র কোরো না।

যদি বিশেষ কারণে কর্তব্যবোধে তোমাকে কারও জন্য বা কিছুর জন্য অনুরোধ করা আবশ্যক হয়ে ওঠে তবে সে চিঠি কোনো আবেদনকারীর হাত দিয়ে পাঠাব না— সে আমি নিজেই তোমার হাতে পৌঁছিয়ে দেব।

কাল অপরাহ্নে সিংহল যাত্রা করব। ফিরে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় মনোযোগ করা যাবে।

ইতি—

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ মে, ১৯৩৪

সুদূরের আলোকবর্তিকা : ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ড. সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাসে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হলেন এক মহান ব্যক্তিত্ব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদ হিসেবে যুক্ত থাকার সময়ে ১৯২৯ সালে তিনি বঙ্গীয় আইনসভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কংগ্রেস মনোনীত পদপ্রার্থী রূপে যোগ দেন। এভাবেই শিক্ষার অঙ্গন থেকে রাজনীতির অঙ্গনে তাঁর পদার্পণ ঘটে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-পূর্ব এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী কয়েক দশকের অন্যতম প্রধান রাজনীতিবিদ হলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। অখণ্ড বঙ্গের আইনসভায় মন্ত্রী থাকাকালীন তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন, 'আমার প্রবণতা মূলত শিক্ষামূলক প্রশাসনের মধ্যেই নিহিত ছিল এবং আমি একজন রাজনীতিবিদের কোলাহলপূর্ণ এবং ধুলোময় কর্মজীবনের প্রতি কখনোই আকর্ষণ অনুভব করিনি। আমি ভেবেছিলাম আমার দেশকে সেবা করার সব থেকে ভালো উপায় হলো শিক্ষার পথ'।

এর থেকেই বলা যেতে পারে যে, শ্যামাপ্রসাদ কখনোই চাননি রাজনীতির কোলাহলপূর্ণ ও ধূলিময় পরিবেশে প্রবেশ করতে, বরং শিক্ষাক্ষেত্রেই তিনি তাঁর জীবন অতিবাহিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁকে বাধ্য করেছিল শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রাজনীতির মঞ্চে প্রবেশ করতে।

শিক্ষাক্ষেত্র থেকে পূর্ণ সময়ের জন্য রাজনীতিতে প্রবেশের মূল কারণ ছিল বঙ্গের হিন্দুদের ক্রমবর্ধমান দুর্দশা। এই দুর্দশার মূল নিহিত ছিল কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লিগ মন্ত্রীসভার চরম সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডের মধ্যে। আইন দ্বারা হিন্দুদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ছাড়াও সরাসরি হিন্দুদের উপর অত্যাচার ধীরে ধীরে ভয়াবহ রূপ নিতে শুরু করে। হিন্দু মন্দির অপবিত্র করা, হিন্দু বিগ্রহ বা প্রতিমা ভেঙে দেওয়া এবং হিন্দু নারীর প্রতি অত্যাচার ক্রমশই বেড়ে চলছিল। এই অবস্থায় শ্যামাপ্রসাদ বুঝতে পেরেছিলেন যে, কংগ্রেস তাদের তোষণনীতি বজায় রাখতে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বিষয়ে তেমন দৃষ্টিপাত করবে না। এরই মধ্যে ১৯৩৯ সালে হিন্দু মহাসভার নেতা বীর সাভারকর কলকাতায় আসেন এবং হিন্দু মহাসভার আদর্শ প্রচার করেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সাভারকরের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন এবং অতি দ্রুত তিনি ওই সংগঠনের সর্বভারতীয় কার্যকরী সভাপতি পদে উন্নীত হন।

ড. শ্যামাপ্রসাদ লক্ষ্য করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের কোনো সহযোগিতা নেই। তিনি মনে করতেন, হিন্দুদেরই কঠোর সংগ্রাম করে, সর্বস্ব উৎসর্গ করে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। হিন্দু মহাসভার মধ্য দিয়ে তিনি সেই সংগ্রামকে কঠোরতর করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন, 'সংগ্রাম আমরাই করব, কিন্তু জয়লাভ করলে তার সুফল সকলের সঙ্গে ভাগ করেই ভোগ করব।'

পরবর্তী সময়ে শ্যামাপ্রসাদ বঙ্গীয় আইনসভায় হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেন এবং হক মন্ত্রীসভায় তিনি অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

রাজনীতিতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নানা কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। বঙ্গীয় মন্ত্রীসভায় থাকাকালীন সময়ে তিনি বঙ্গের হিন্দুদের অধিকারের দাবিতে বিশেষভাবে সোচ্চার হন। তিনি বঙ্গের হিন্দুদের উপর মুসলিম লিগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারবার কংগ্রেসের কাছে আবেদন জানান। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েও কংগ্রেস এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু ১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে মুসলিম লিগ যখন পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ করে সমগ্র বঙ্গ ও পঞ্জাবকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির দাবি উত্থাপন করে, তখন থেকেই শ্যামাপ্রসাদ তার বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করেন।

শ্যামাপ্রসাদ কোনোমতেই ভারত বিভাগের সমর্থক ছিলেন না। এমনকী মুসলিম লিগের ডাইরেক্ট অ্যাকশনের পরও নয়। তার একমাস পর বঙ্গের আইনসভায় সুরাবর্দি মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের উপর আলোচনাকালেও তিনি বঙ্গ ভাগ তো দূরের কথা ভারত ভাগের পক্ষেও কোনো কথা বলেননি। বরং দাঙ্গায় নিহত হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গরিব জনসাধারণের নির্মম হত্যার জন্য মুসলিম লিগের নেতাদের অভিযুক্ত করেন।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগের অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ সমগ্র বঙ্গ যখন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছে ড.শ্যামাপ্রসাদ তখন বঙ্গ বিভাগে সোচ্চার হলেন। তাঁর দাবি ছিল যে, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে যখন দেশভাগ হচ্ছে, তখন বঙ্গ বিভাগ করে হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিমাংশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠন করে ভারতভুক্তি করতে হবে। এমতাবস্থায় তিনি বঙ্গ বিভাগের জন্য জনমত গঠনে আন্দোলন শুরু করেন এবং তাঁরই উদ্যোগে বঙ্গ বিভক্ত করে পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি হয়ে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বঙ্গ বিভাগ করে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি করা ড. শ্যামাপ্রসাদের অন্যতম কৃতিত্ব। এ প্রসঙ্গে নেহেরু একবার শ্যামাপ্রসাদকে বলেছিলেন যে, 'আপনিও তো দেশভাগ সমর্থন করেছিলেন।' উত্তরে সেদিন শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন , 'আপনারা ভারত ভাগ করেছেন, আর আমি পাকিস্তান ভাগ করেছি।'

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর জনপ্রিয়তার ভয়ে কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা তাঁকে ইতিহাসের পাতা থেকে প্রায় মুছে ফেলেছিল। পশ্চিমবঙ্গবাসী তাঁর কাছে অশেষ ঋণী। তিনিই ছিলেন পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে সুদূরের আলোকবর্তিকা। আবার তিনি ছিলেন ভারতের অখণ্ডতার প্রতীক। তাই তিনি কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা সম্পর্কে সংসদে (১৯৫২-তে দক্ষিণ কলকাতা থেকে নির্বাচিত হয়ে) বলেছিলেন, 'এক দেশে দুই বিধান, দুই নিশান ও দুই প্রধান কোনোমতেই চলবে না।'

ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতার জন্য যিনি জীবন বলিদান করেছেন, সেই মহান রাষ্ট্রবাদী চিন্তাবিদ, মহান শিক্ষাবিদ, জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা এবং আমাদের পথপ্রদর্শক পরম শ্রদ্ধেয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাই আমাদের ভরসা হয়ে ওঠেন বারে বারে। তাঁর একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে— 'আমরা উন্নতি করব। আমরা এক হব। আমরা এমন দেশে থাকব যার ভাগ্য কেবল তাঁর সন্তানদের হাতে থাকবে। যেখানে এক স্বতন্ত্র হিন্দুস্থানের পতাকা সবসময় শান্তির প্রতি প্রগতি, সহনশীলতার প্রতি স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করবে।' □

হিন্দুর নিরাপদ বাসভূমি ‘পশ্চিমবঙ্গ’-এর সৃষ্টিকর্তা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পিন্টু সান্যাল

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন—

‘কোথায় ফলে সোনার ফসল, সোনার কমল ফোটে রে?

সে আমাদের বাঙ্গলাদেশ, আমাদেরই বাঙ্গলা রে!’

বাঙ্গালির বঙ্গভূমি আজ বিভক্ত। একসময়ের পূর্ববঙ্গ আজ ইসলামি বাংলাদেশ। পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হওয়ার ইতিহাসও রক্তাক্ত। কাঁটাতারের এপারে ‘আপাতত সুরক্ষিত’ যে ভূমিতে বাঙ্গালি বাঁচার আশায় এখনো বিশ্বাসী তার নাম— পশ্চিমবঙ্গ।

ইসলামি বাংলাদেশে প্রতিবছর দুর্গাপূজার সময় মূর্তি ভাঙচুরের খবর পাওয়া যায়, হিন্দু যুবতীদের জোরপূর্বক ধর্মান্তরণের খবর পাওয়া যায়, তা দেখে পশ্চিমবঙ্গে সুরক্ষিত হিন্দুর বাসভূমির নেপথ্য নায়ককে স্মরণ করতেই হয়। এই ‘পশ্চিমবঙ্গ’ ছিল বলেই লক্ষাধিক হিন্দু পূর্ববঙ্গ থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে শুধুমাত্র নারীর সম্ভ্রম ও জীবনরক্ষার আশায় পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি দিয়েছে বছরের পর বছর। একসময় যারা স্লোগান তুলেছিল ‘বাংলা ভাগ করলো কে? শ্যামাপ্রসাদ আবার কে?’--- সেই কমিউনিস্টরাও নিজেদের কমিউনিজমের তত্ত্বকে ইসলামি বাংলাদেশে চালাতে পারেনি।

ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বলেই হয়তো যে বাঙ্গালি স্বামী বিবেকানন্দ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের একজাতীয় বলে গর্ববোধ করে, তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। হিটলারের ইহুদি নিধন যজ্ঞের ইতি টেনেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়, কিন্তু বাঙ্গালি তথা হিন্দু নিধন যজ্ঞের ইতি টানতে বাঙ্গালি হিন্দুদের সুরক্ষিত বাসভূমি ‘পশ্চিমবঙ্গ’ সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্যামাপ্রসাদ যে রাজনৈতিক যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন তার তাৎপর্য হিন্দু বাঙ্গালি সময়ের প্রবাহের সঙ্গে বেশি করে উপলব্ধি করছে।

১৯০৫ সালে অখণ্ড বঙ্গের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জাগরণকে স্তব্ধ করতে বড়লাট কার্জন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব করেছিল। সেই চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাঙ্গালি সমাজে জাতীয়তাবোধের স্ফুরণ ঘটেছিল, আর সেই একাত্মবোধকে ধ্বংস করতে কার্জনের প্ররোচনায় হিন্দু-মুসলমান বিভেদকে হাতিয়ার করতে মুসলিম লিগের জন্ম হয়। তবুও ৬ বছর পর বঙ্গভঙ্গ রদ করতে হয়। কিন্তু তার ৩৬ বছর পর কী এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলো যে হিন্দু সমাজ বঙ্গবিভাগের মধ্যেই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার আশা দেখতে পেল

১৯০৯ সালের ‘ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট’

With Best Compliments

From :

A

Well Wisher

অনুযায়ী প্রথম মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার (সেপারেট ইলেক্টরেট) দেওয়ার মাধ্যমে বিভেদের বীজ পোঁতা হয়। ইংরেজের মুসলিম লিগ তোষণের পর কংগ্রেসের মুসলিম লিগ তোষণ শুরু হয়। উভয়ের মধ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে কংগ্রেস নিজেদের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা মেনে নেয়। তাছাড়া যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেসব প্রদেশে মুসলমানদের জনসংখ্যার অনুপাতের চেয়ে বেশি আসন দেওয়ার নীতিও মেনে নেওয়া হয়। বঙ্গীয় আইন পরিষদে ১৪৪ জন সদস্যের মধ্যে সাধারণ আসন সংখ্যা ছিল ৩৯, সংরক্ষিত মুসলিম আসন ছিল ৪৬। পুরো বঙ্গ যে মুসলমান শাসনাধীনে যাবে তার বীজ পোঁতা হলো ১৯১৯-এর ভারত শাসন আইন (মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইন) ও লক্ষ্ণৌ চুক্তির মাধ্যমে। মুসলমান সম্প্রদায়কে স্বাধীনতা আন্দোলনে সঙ্গে পেতে গান্ধীজীর খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন--- ভয়াবহ সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন, হিন্দু নিধন প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভাজনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মাধ্যমে হিন্দু সমাজকে বর্ণ হিন্দু ও বি-বর্ণ হিন্দুতে ভাগ করে আসন বণ্টন হলো। পঞ্জাবেও একই কাজ করা হলো। বঙ্গ ও পঞ্জাব— এই দু'টি প্রদেশের হিন্দু ও শিখদের উপর ইংরেজের জাতক্রোধ ছিল, কারণ এদের হাতেই সহিংস ও অহিংস পন্থায় ব্রিটিশ প্রশাসনকে নাকানিচোবানি খেতে হয়েছিল। কবিগুরু এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাতে অশনিসংকেত দেখেছিলেন। এর মধ্যেই ১৯১৭ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত দেশে-বিদেশে মুসলিম লিগ ও বিভিন্ন মুসলমান নেতৃত্ব ভারত ভাগ তথা পাকিস্তান প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে। 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা'র কবি মহম্মদ ইকবাল এর মধ্যে অন্যতম। একসময়ের কংগ্রেসি মহম্মদ আলি জিন্না মুসলিম লিগ রাজনীতির ভার গ্রহণ করলেন। মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে যখন মুসলিম লিগ নিজেদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করছে, তখন কংগ্রেস মুসলমানদের মন পেতে মুসলিম লিগের সঙ্গে আপোশের পথ নিয়েছে; কিন্তু হিন্দুর স্বার্থরক্ষা দূরে থাক, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মন্ত্র 'বন্দে মাতরম্' থেকেও নিজেদের দূরত্ব বাড়াতে শুরু করেছে কংগ্রেস।

১৯৪৬ সালের ৩ জানুয়ারি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কংগ্রেসের তোষণ নীতি আর মুসলিম লিগের কট্টরপন্থী অবস্থানের জন্য হিন্দু সমাজের নিরাপত্তাহীনতার কথা লিখেছেন— '১৯৪২ সালের আন্দোলন শুরু হবার পূর্বেই কংগ্রেস নেতারা জেলে আবদ্ধ হয়েছিলেন। গত তিন বৎসর হিন্দু মহাসভা সব দিক দিয়ে রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে, কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবি জানিয়েছে, বিপদে-আপদে দেশকে সেবা করার জন্য এগিয়ে গিয়েছে, মুসলিম লিগ ও ইংরেজের মিলিত চেষ্টায় যখন হিন্দু দলিত হয়েছে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে।

... আরও অনেক কিছু হিন্দুসভা এর মধ্যে করেছে যার বিশদ বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন এখানে নেই। মুসলিম লিগের প্রতিপত্তি শুধু ইংরেজ তোষণে বাড়েনি— কংগ্রেস ও তার নেতৃত্ব অনেক সময় লিগের বিভিন্ন আবদার সহ্য করেছে, তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, জিন্নার পায়ের তলায় গান্ধীজী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা লুটিয়ে পড়েছেন। এই সর্বনেশে তোষণ-নীতির ফলে লিগের শক্তি আরও বেড়ে উঠেছে। ভারতীয়রা মুসলিম লিগকে যতই অপছন্দ করুক না কেন, ভারতের স্বাধীনতার অন্তরায় হিসাবে তার কার্যনীতির যতই নিন্দা করা হোক না কেন, এ কথা মানতে হবে যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুসলমান জনসমাজের ভিতর লিগ এক অভূতপূর্ব নতুন প্রাণসঞ্চার করেছে। তারা ভাবে কী প্রকারে মুসলমান-গরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলিম শাসন স্থাপিত হবে, কী করে তাদের জাতীয় শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হবে। কিন্তু হায়, হিন্দু হিসেবে এই চিন্তা হিন্দু সমাজ করে না।'

এই সময় হিন্দু মহাসভার প্রয়োজনীয়তা আর দেশভাগ সম্পর্কে দলের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন ভারতকেশরী— 'কংগ্রেস তাদের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস ভারতের জনসাধারণের মনে স্বাধীনতার যে চেতনা জাগিয়েছে তার মূল্য কম নয় তা জানি। কিন্তু কিছুকাল ধরে মুসলমানদের মধ্যে যে নূতন রাষ্ট্রীয় চেতনা জেগেছে, যা দেখা দিয়েছে পাকিস্তান রূপ নিয়ে, তার বিরুদ্ধে হিন্দুকে রক্ষা করার কোনো শক্তি দান করতে পারেনি। হিন্দু মহাসভার এখানে সব চেয়ে বড়ো দান। ভারত স্বাধীন হোক, এ তো আমাদের কাম্য। কিন্তু ইংরেজের গোলামি ছেড়ে আমরা পাকিস্তানির গোলামি করতে প্রস্তুত নই। ভারতে বা ভারতের কোনো প্রান্তে ইসলামের পতাকা উড়তে থাকবে এ আমরা স্বীকার করতে চাই না। সারা হিন্দুস্থানে শতকরা ৭৫ জন হিন্দু; যদি গণতন্ত্রের উপর ভারতের প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে ওঠে, এটা স্বীকার করতে হবে যে তাহলে সারা ভারতের যে গভর্মেন্ট হবে তার মধ্যে হিন্দুর প্রভাব থাকবে বেশি। আর ভারতকে খণ্ডিত করার কোনো প্রস্তাবই আমরা মানতে প্রস্তুত নই।'

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই উপলব্ধি ছিল দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বপ্রতিভ ডঃ মুখোপাধ্যায় সমসাময়িক পরিস্থিতি উপলব্ধি করে রাজনৈতিক ময়দানে নামতে বাধ্য হন। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে নিজেকে মেলে ধরার সময়। শিক্ষাক্ষেত্রে অভিজ্ঞ শ্যামাপ্রসাদের এইসময় রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। তিনি ১৯২৯ সালে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও কৃষক প্রজা পার্টির ফজলুল হকের সঙ্গে সরকার

With Best Compliments
from :

PAHARPUR COOLING TOWERS LTD.

PAHARPUR HOUSE
8/1/B, Diamond Harbour Road
Kolkata - 700 027, India
www.paharpur.com
CIN : U02005WB1949PLC018363
Ph. +91-33-4013 3000
Dir. +91-33-4013 3403
Fax : +91-33-4013 3499
vswarup@paharpur.com

গঠনে অসম্মত হয়। ফলে কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে মুসলিম লিগ ক্ষমতা দখল করে এবং বঙ্গে কার্যত মুসলমান শাসন স্থাপিত হয়। তারা শিক্ষাক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ শুরু করে। তার ফলে সমাজের সর্বক্ষেত্রে হিন্দুরা বঞ্চিত হতে থাকে। এই অবস্থায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিপ্লবী বীর সাভারকরের ডাকে হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন। এই অবস্থায় লাহোরে জিন্নার সভাপতিত্বে মুসলিম লিগের অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়। সুভাষচন্দ্র-বিহীন কংগ্রেসের দৃঢ়তার অভাবে জিন্না পাকিস্তানের দাবিতে অনড় থাকেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দেশ বিভাজনের বিরুদ্ধে মুখর হন এবং জিন্নার বিভেদ নীতি সম্পর্কে সবপক্ষকে বোঝাতে থাকেন। ১৯৪০-৪১ সালে নোয়াখালি ও ঢাকার দাঙ্গায় হিন্দুরা অত্যাচারিত হয়। ১৯৪১ সালে বঙ্গীয় মুসলিম লিগ ফজলুল হক সরকার থেকে সমর্থন তুলে নিলে হিন্দু মহাসভার সমর্থনে ‘শ্যামা-হক সরকার’ গঠিত হয়। এই সময় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আইন পরিষদের ভিতরে পাকিস্তান দাবির বিপক্ষে সোচ্চার হন। ১৯৪৬ সালের দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনে জিতে কংগ্রেস সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু মুসলিম লিগ মন্ত্রীসভায় যোগদানে বিরত থাকে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বঙ্গপ্রদেশে মুসলিম লিগ জিতলে সুরাবর্দি প্রধানমন্ত্রী হন। পাকিস্তানের দাবিতে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট ‘ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে’-র ডাক দেয় মুসলিম লিগ। প্রথমে কলকাতায় ও পরে নোয়াখালি, ত্রিপুরা, ঢাকা-চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দুদের উপর একতরফা আক্রমণ, লুঠপাট, নারীজাতির লাঞ্ছনা, অগ্নিসংযোগের মতো অসংখ্য ঘটনা ঘটল। বাঙ্গালি হিন্দুর নিরাপদ বাসভূমির জন্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ বঙ্গ বিভাগের ডাক দিলেন। অন্যদিকে হোসেন শহিদ সুরাবর্দি ‘স্বাধীন যুক্তবঙ্গ’-এর পক্ষ নিল, যাতে পরবর্তীকালে মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ যুক্তবঙ্গকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া যায়। ১৯৪৬-এর ১৬ই অক্টোবর নোয়াখালির সন্ত্রাস বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করে আচার্য কৃপালনী বিবৃতি দেন। মুসলিম লিগের শাসনাধীন বঙ্গে হিন্দুদের উপরে অত্যাচারের খবর যাতে বিশ্বের লোকেরা জানতে না পারে সেই চেষ্টার কোনো খামতি ছিল না। সেই সময়ে বঙ্গের গভর্নর বারোজ মন্তব্য করেন যে, এক ডজন গান্ধীরও সাধ্য নেই নোয়াখালিতে শান্তি ফিরিয়ে আনার। এই সময় অবিভক্ত পঞ্জাবেও পাকিস্তানের দাবিতে জেহাদি সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। তারকেশ্বরে হিন্দু মহাসভার কনফারেন্সে বঙ্গ বিভাগের দাবিকে গণদাবিতে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আইনসভার কংগ্রেসি প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান— তাঁরা যে হিন্দুদের ভোটে জিতেছেন, সেই হিন্দুদের স্বার্থ তাঁরা রক্ষা করুন। কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের মতামতের তোয়াক্কা না করে হিন্দু মহাসভার প্রস্তাব অনুসারে বঙ্গের হিন্দু-গরিষ্ঠ ও মুসলমান-গরিষ্ঠ অঞ্চলের জন্য দু’টি আলাদা মন্ত্রীসভা গঠনের দাবি তোলা হয়।

ডঃ মুখোপাধ্যায় কখনোই চাননি কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর বিবাদ শুরু হোক। তিনি চেয়েছিলেন যেকোনো মূল্যে দেশভাগ রুখতে। তিনি ভেবেছিলেন হিন্দুদের নিরাপত্তার প্রশ্নে কংগ্রেস তাঁর পাশে দাঁড়াবে, কিন্তু কংগ্রেস অনেককাল আগে থেকেই বিভ্রান্ত। ডঃ মুখোপাধ্যায় নিজের ডায়েরিতে লিখছেন— ‘মাঝে মাঝে এত রকমের সুযোগ আমার হাতে এসেছে যে তখন যদি শুধু হিন্দুসভাকে দল হিসাবে বড়ো করতে চাইতাম, অনেক কিছু করতে পারতাম। কিন্তু তা করিনি এই বিশ্বাসে যে বঙ্গে কংগ্রেস আর হিন্দুসভার দুইয়েরই স্থান দরকার। যতদিন হিন্দু-ধ্বংসকারী লিগ-ইংরেজ ষড়যন্ত্র চলবে এবং নানা দিক থেকে হিন্দুদের উপর আঘাত চলতে থাকবে; সেজন্য একটা হিন্দুদের জন্য রাজনৈতিক দল থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই দল ভারতের স্বাধীনতার পরিপন্থী হবে না; সহায়তাই করবে, আর হিন্দুকে রক্ষা করতে কোনোরকমে পশ্চাৎপদ হবে না। আমি সব সময়ে চেয়েছি যে এইভাবে কংগ্রেস ও হিন্দুসভার মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া উচিত। বঙ্গে কংগ্রেস-দলাদলি ভারতপ্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সুভাষ গান্ধীজীর সঙ্গে বিবাদ করেছিলেন— কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হলেন। তাঁর অনুচরেরা কংগ্রেস থেকে ধাক্কা খেলেন। শরৎ বসুর দল কংগ্রেস হাইকমান্ডের কথা না শুনে পৃথক হলো। এ সব তো জানা কথা। এই কারণেই বঙ্গে কংগ্রেস কয় বৎসর ধরে তেমন সবল হয়ে উঠল না। আমার নেতৃত্বে যখন হিন্দুসভা গড়ে উঠল, আমি দু’দলের কারও সঙ্গে ঝগড়া করিনি। সদভাবই রেখেছি সবার সঙ্গে, আর যখন কোন বড় বিপদ এসেছে-সব দল যাতে একত্র কাজ করতে পারে তার পথ খুঁজেছি।’

একদিকে মুসলিম লিগের কট্টরপন্থী হিন্দুবিরোধী অবস্থান আর কংগ্রেসের তোষণ নীতির জন্য দিশাহীন পরিস্থিতির মাঝে দাঁড়িয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা হিন্দু স্বার্থরক্ষায় অভিমন্যুর মতো লড়ছে।

মাউন্টব্যাটেনকে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ বলেন— পাকিস্তান সৃষ্টি হলে বঙ্গ বিভাগ করতেই হবে। বঙ্গ বিভাগের দাবিতে ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, যদুনাথ সরকার, বিজ্ঞানী ড. মেঘনাদ সাহা, ভাষাবিদ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ শিক্ষাবিদ যুক্ত হন। অমৃতবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বঙ্গ বিভাগের পক্ষে জনমত সংগ্রহ করা হয়। বেশিরভাগ হিন্দু বঙ্গ বিভাগের পক্ষে দাঁড়ায়, এমনকী বিভিন্ন বার অ্যাসোসিয়েশন ও সামাজিক সংগঠন বঙ্গ বিভাগের দাবিতে সোচ্চার হয়। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় আইনসভায় দুই বঙ্গের বিধায়কদের ভোটে বঙ্গ বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জিন্না পাকিস্তান পেলেন কিন্তু ইতিহাস বলে যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড ‘পশ্চিমবঙ্গ’কে ছিনিয়ে আনার কৃতিত্ব ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের।

আজ যদি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘কোন দেশে’ কবিতার ‘বাঙ্গলাদেশ’ খুঁজতে হয় তাহলে তা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্য গোটা বিশ্বের মধ্যে একমাত্র এই পশ্চিমবঙ্গেই অবশিষ্ট রয়েছে—‘চণ্ডীদাসের রামপ্রসাদের কণ্ঠ কোথায় বাজেরে? সে আমাদের বাংলাদেশ, আমাদেরই বাঙ্গলা রে!’

কিন্তু এই পশ্চিমবঙ্গের জন্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লড়াই আর তাঁর জন্য হিন্দু বাঙ্গালির এই নিরাপদ ভূমি সৃষ্টির ইতিহাস ১৯৪৭-পরবর্তী পর্যায়ে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে বাঙ্গালিকে জানতে দেওয়া হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে নতুন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সকল বাঙ্গালির উপর এই দায়িত্ব এসেছে বর্তমান প্রজন্মকে তাঁদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ইতিহাস জানানোর। □

With best Compliments from :

CASTRON TECHNOLOGIES LIMITED

Manufacturer of :

FERRO MANGANESE

SILICO MANGANESE

LOW PHOS FERRO MANGANESE

Regd. office :

14, Bentinck Street, 1st floor, Room No. 8

Kolkata - 700 001, West Bengal (India)

Phone : (91-33) 22624465

Head Office :

Yogamaya, Dhaiya, Post - Nag Nagar

DHANBAD - 826 004, Jharkhand (India)

Phones : (91-326) 2207886, 2203390

Fax : (91-326) 2207455, E-mail : atul@castrontech.com

Works :

Phase- III/B-4, B-5, Bokaro Industrial Area

Balidih, Bokaro Steel City - 827 014

Jharkhand (India)

Phones : (91-6542) 253511, Fax : (91-6542) 253701

শিক্ষাবিদ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ড. বিভাসকান্তি মণ্ডল

মাত্র ৩৩ বছর বয়সে যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ অলংকৃত করেছিলেন সেই বিস্ময়কর প্রতিভার নাম ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কেবল কলকাতা নয়, কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আজও পর্যত এতো কম বয়সে কেউ উপাচার্য হয়েছেন বলে অন্তত জানা নেই। সেই মহান প্রতিভার শিক্ষাজীবন কেমন ছিল তা জানার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

তাঁর পরিবারের আদি নিবাস ছিল তখনকার হুগলী জেলার জিরাট-বলাগড় গ্রামে। কিন্তু তাঁর শিক্ষাজীবন কেটেছে কলকাতায়। তার কারণ, তাঁর পিতামহ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৮৩৬ সালে যদিও ওই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু অত্যন্ত মেধাবী হওয়ায় তিনি কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে আসেন। সেই সূত্রে ভবানীপুরে বসবাস। মেধাবী পিতামহের মহান মেধাবী সন্তান স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর পুত্র সেই প্রতিভাধর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। জিনগত কারণটি বোঝাতেই এই পরম্পরা সূত্রের অবতারণা। কাছেই বিখ্যাত মিত্র ইন্সটিটিউশনে শ্যামাপ্রসাদের পড়াশোনা। ১৯১৬ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় তিনি ১৭তম স্থান অধিকার করেন। তৎকালীন যুগে এই ফলাফলই বুঝিয়ে দেয় যে তাঁর জিনগত প্রতিভা কতখানি। কেবল তাই নয়, প্রেসিডেন্সির মতো বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সালটা ছিল ১৯২১। তিনি সাহিত্য ভালোবাসতেন। তাই ইংরাজি সাহিত্য পড়ার পর বাংলা সাহিত্যও পড়লেন। ১৯২৩ সালে বাংলা সাহিত্যে স্নাতোকোত্তর ডিগ্রি লাভ করলেন। তিনি যে সত্যিকারের এক প্রতিভাধর তাঁর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ থেকে সেটা বোঝা যায়। এর পরের বছরই অর্থাৎ ১৯২৪ সালে বিএল ডিগ্রি লাভ করেন। সাহিত্যের সঙ্গে আইনের তেমন সম্পর্ক থাকার কথা নয়, কিন্তু প্রতিভাবানদের বিচরণভূমি এমনই হয়। সাহিত্যের আপাদমস্তক ছাত্র পেশা হিসেবে আইন বেছে নিলেন। ১৯২৪ সালেই কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে নাম নথিভুক্ত করেন।

এই সামান্য বিএল ডিগ্রিতে কি শ্যামাপ্রসাদ আটকে থাকতে পারেন! তিনি চলে গেলেন ইংল্যান্ডে (নেতাজীর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল)। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯২৬ সালে ইংল্যান্ডের লিংকসন ইন থেকে ব্যারিস্টার হন। তখনকার দিনে ব্যারিস্টার অফ ল ডিগ্রি ছিল মহামূল্যবান। এর মাত্র ৭ বছর পর অর্থাৎ ১৯৩৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হন।

স্বভাবতই মনে আর একটি প্রশ্ন জাগে যে, তিনি কোন বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন? এই মহান শিক্ষাবিদ শিক্ষাক্ষেত্রে এমনই অবদান রেখেছিলেন যে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক পি এইচ ডি লাভ না করলেও ১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডিলিট উপাধি দেয়। ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার গুরুত্ব বুঝেছিলেন। বাংলা ভাষার প্রসারে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা সমস্ত বাঙ্গালির মনে রাখা উচিত। তাঁর সময়কালেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমবার বাংলায় ভাষণ দেন। তিনি উচ্চ শিক্ষায় স্থানীয় ভাষার প্রবর্তক। আদ্যপ্রান্ত ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির সাধক ছিলেন তা তাঁর সামগ্রিক জীবনের দিকে তাকালে বোঝা যায়। ভারতীয় সংস্কৃতির গভীর সাধক নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানীয় ভাষা চালু করেছিলেন প্রত্যেকের মাতৃভাষাকে সম্মান দিতে। এক্ষেত্রে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি কতখানি মুক্তমনের মানুষ ছিলেন। তিনি দেশের সংস্কৃতির শেকড়ে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু কোনোভাবেই সাম্প্রদায়িক নন। তিনি ছিলেন জাতীয় চেতনার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। কেবল ভাষা নয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিকেও তাঁর বিশেষ নজর ছিল। সে কারণেই তিনি ফলিত পদার্থবিদ্যা, কৃষি, ওয়ানস্পেস বিজ্ঞানের পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তিতেও জোর দিয়েছিলেন। তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সও তিনি চালু করেন।

জাতীয় জীবনে শিক্ষার কতখানি গুরুত্ব তা ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্যক অনুভব করেছিলেন। মাত্র চার বছর সময়কালে উপাচার্য হিসেবে তিনি প্রায় চার দশকের সমান কাজ করেছেন। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনকে পরিচালিত করেছে তাঁর অন্তরের সত্যকার শিক্ষা। ভারতবর্ষের অন্যতম শিক্ষাবিদ এই মহান মানুষটি তাঁর শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভাবনা সারা ভারতবর্ষব্যাপী ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। তাই এই ভারতের সংস্কৃতির অন্যতম ধারক বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে এল এল ডি উপাধিতে ভূষিত করেছিল। যথার্থ শিক্ষাবিদ ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জীবনব্যাপী সেই ধারণা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। আমরা তখন তার মর্ম না বুঝলেও বর্তমানে ভারতবর্ষের দিকে তাকালে তা সহজেই অনুমেয়। যে বীজ তিনি বপন করেছিলেন, সেই বৃক্ষ আজ ফুলেফলে বিশাল হয়ে উঠেছে।

৬ জুলাই জন্মদিবস। এই বিস্ময়কর সৃজনশীল প্রতিভাধর মানুষটিকে আজ বিশেষভাবে স্মরণ করি ও প্রণতি জানাই। ■

With Best Compliments from -

ARDA

অধিক দুধ উৎপাদন ও গবাদি পশুর সুস্বাস্থ্যের জন্য সমস্ত দুধ উৎপাদকগণের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য

- আলো বাতাসযুক্ত পরিষ্কার পরিবেশ শুকনো সমতল গোয়ালের ব্যবস্থা করুন।
- গবাদি পশুকে সুষম খাদ্য খাওয়াবেন, যার মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ইত্যাদি উপযুক্ত মাত্রায় রয়েছে।
- একবার খাওয়ালে হজম করতে ৮ ঘণ্টা সময় লাগে, তাই দিনে দু'বারই খাবার দেবেন।
- গবাদি পশুকে খাওয়াবার এক থেকে দুই ঘণ্টা পর জল খাওয়াবেন।
- গবাদি পশুকে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে সবুজ ঘাস খাওয়াবেন।
- মশা, মাছি, এটুলি থেকে গোয়ালঘরকে মুক্ত রাখতে পারলে গবাদি পশুকে অনেক ভয়ঙ্কর রোগ থেকে রক্ষা করা যাবে।
- অম্বল বা বদহজম থেকে আপনার গবাদি পশুকে রক্ষা করতে ভাত সেদ্ধ খাবার বা ভিজিয়ে খাবারের অভ্যাস ত্যাগ করুন।

পারিবারিক জীবনে ড. শ্যামাপ্রসাদ

নন্দলাল ভট্টাচার্য

‘শ্যামাপ্রসাদ স্ত্রীকে পাশে চেয়েছিলেন অনেকটা সখী ও সচিবের মতো, যে তাঁকে বুঝবে। আন্তরিক শুভকামনা দিয়ে তাঁকে বেঁধে রাখবে। কর্মপথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা জোগাবে। স্ত্রী সুধার মধ্যে তিনি এসবই পেয়েছিলেন।’

‘প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে
আমারই এ দুয়ারে প্রান্তে...’

এ কোনো গান নয়, কথা নয়, এযেন শ্যামাপ্রসাদের জীবনেরই আর্তি।

সালটা ১৯২২। শ্যামাপ্রসাদ তখন বাংলা স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র। বাবা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সে সময় তাঁর বিয়ে ঠিক করলেন। পাত্রী তাঁদের পালটি ঘর। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর নাতনি। সেই বিহারীলাল, যাঁকে রবীন্দ্রনাথ গুরু বলে মেনেছিলেন। বলেছিলেন বাংলা নীতি কবিতার ‘ভোরের পাখি’।

মেয়ের বাবা ডাঃ বেণীমাধব চক্রবর্তী সে সময়ের একজন নাম করা ডাক্তার। তাঁরই মেয়ে সুধা। তাঁরই সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের বিয়ে ঠিক করলেন আশুতোষ। সেকালের রীতিতে, বাবার কথার পর কথা চলে না। অতএব বিয়ে পাকা।

দাদা রমাপ্রসাদের বিয়ে হয়েছিল দু’ বছর আগে। সে সময় পাত্রী পছন্দ করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ দিদি কমলার সঙ্গে গিয়ে। কিন্তু এবার!

বাড়ির আর সকলে মেয়ে দেখতে গেলেও শ্যামাপ্রসাদ নিজে সম্ভবত যাননি। সে নিয়ম যে ছিল না তখন।

বিয়ের আগে অন্যদের মুখে পাত্রী সুধার কথা শুনে শ্যামাপ্রসাদ মনে মনে তৈরি হয়েছিলেন তরুণ বয়সের প্রেমের জন্য। ‘সুধা’ নামটি দারুণ পছন্দ হয়েছিল তাঁর। মনে মনে একটা ছবি এঁকেছিলেন। সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, নাম যার সুধা, সে নিশ্চয়ই হবে অমৃতা—ভরিয়ে দেবে তাঁর জীবনকে।

বিয়ে হয়ে গেল ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ এপ্রিল। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের তেসরা বৈশাখ, রবিবার। সে এক এলাহি ব্যাপার।

সকালে নান্দীমুখ, গায়ে হলুদ পর্ব মিটে যাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল বরকে নিয়ে বিয়ের আসরে যাওয়ার তোড়জোড়। ভবানীপুরে মুখুজ্জে বাড়ি আর নিমতলা স্ট্রিটের অক্ষয়দত্ত লেনে চক্রবর্তী বাড়ি— দু’ জায়গাতেই দারুণ ব্যস্ততা সেদিন।

দূরে গঙ্গার পশ্চিম দিগন্তে বিকেলের লাল সূর্যটা ডুবুডুবু। বাতিওয়ালা মই কাঁধে জ্বেলে চলেছে রাস্তার আলোগুলো। ওই রকম একটা সময় একটি সুসজ্জিত ট্রাম এসে দাঁড়াল ভবানীপুরে। সেই ট্রামে করেই বরযাত্রীরা যাবেন নিমতলা স্ট্রিটের বিয়েবাড়িতে। সেরকমই ব্যবস্থা করেছিলেন স্যার আশুতোষ। তারই জন্য একটা আস্ত ট্রাম রিজার্ভ করেছিলেন তিনি। বরযাত্রীদের সঙ্গে তিনিও ছিলেন ট্রামের যাত্রী।

শ্যামাপ্রসাদের পরের ভাই উমাপ্রসাদের স্মৃতিতে— ‘ভবানীপুর থেকে উত্তর কলিকাতার নিমতলা স্ট্রিটে বিবাহবাসরে যোগ দিতে বরযাত্রীদল চলেন রিজার্ভ করা ট্রাম গাড়িতে। বাবাও যান তাতেই উঠে— নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে নিয়ে। সেই একবারই তাঁকে ট্রামে উঠতে দেখেছি।’

যথা সময়ে ট্রাম এল নিমতলায়। হই হই করে সকলে এলেন বিবাহ বাসরে। বিয়ে হয়ে গেল ধুমধাম করে। যথারীতি হলো বউভাতের অনুষ্ঠানও। ক’দিন কাটল বেশ হইহুল্লোড়ে। আস্তে আস্তে বিয়ে বাড়ি ফাঁকা হলো। সকলে ব্যস্ত আবার যে যার কাজে।

কিশোরী বধূকে ভালো লেগেছিল শ্যামাপ্রসাদের প্রথম দেখাতেই। স্ত্রীর চোখে তিনি দেখেছিলেন প্রেম— একধরনের নির্ভরতার আর্তি। শ্যামাপ্রসাদও সাড়া দিয়েছিলেন তাতে। বলতে কী, প্রথম দিন থেকেই তাঁদের জীবন এগিয়ে চলে বিশ্বাস, পারস্পরিক নির্ভরতা আর শর্তহীন এক ধরনের ভালোবাসার ভেলায় চড়ে।

তখনকার সামাজিক

রীতিতে স্ত্রীকে নিয়ে মেতে থাকার অবসর তেমন মিলত না। বিশেষ করে যৌথ পরিবারে। তাছাড়া বিয়ে হলেও শ্যামাপ্রসাদ তখনও ছাত্র। তখনও প্রবেশ করেননি কর্মজীবনে। ফলে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কটা গভীর হলেও বাইরে তার প্রকাশ একটা ছিল না। তার অন্যতম কারণ, শ্যামাপ্রসাদের ব্যক্তিগত জীবনবোধ ও স্বভাব।

ছেলেবেলা থেকেই চেহারায় শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন একটু বড়োসড়ো। ফলে সমবয়সিদের মধ্যেও তাঁর ভূমিকা ছিল অনেকটা গম্ভীর অভিভাবকের। তাই নিজের জীবনের ভালো লাগা অথবা উচ্ছ্বাসের প্রকাশ তিনি সচেতনভাবেই ঘটাতে পারেননি। তাঁর নিজের কথায় 'আমি ছিলাম একটু চাপা স্বভাবের'।

এই চাপা স্বভাবের কারণেই কিশোরী বধূকে নিয়ে স্বপনচারী হয়েও তা প্রকাশ করতে পারেননি। শ্যামাপ্রসাদ-জায়া সুধাদেবীও সেটা বুঝতে পেরেছিলেন খুব ভালোভাবেই। তাই তিনিও সবসময় কিছুটা নীরবেই ছিলেন স্বামীর অনুবর্তিনী। এক রকম অনুচ্চার কথার ফুল দিয়ে হতো তাঁর প্রেমাভিসার।

অন্যদিকে, বিয়ের অল্প কিছুদিন পরেই ছিল শ্যামাপ্রসাদের এমএ পরীক্ষা। এর আগে প্রতিটি পরীক্ষাতেই শ্যামাপ্রসাদ অধিকার করেছেন সর্বোচ্চ স্থান। এমএ পরীক্ষায় সে ধারায় ছেদ পড়লে যে তিনি ও নববধূও বিশেষ সমালোচনার পাত্র-পাত্রী হবেন, এটা বেশ ভালোভাবেই জানা ছিল শ্যামাপ্রসাদের। তাই প্রেমে ভাসা নয়, বরং স্থিত হওয়া ছিল শ্যামাপ্রসাদের লক্ষ্য।

বিয়ের বছরই শ্যামাপ্রসাদের পরিবারে দেখা যায় এমন কিছু ঘটনা, যাতে ব্যস্ত থাকতে হয় তাঁকে খুব গভীর ভাবেই। প্রথমেই অসুস্থ হয়ে পড়েন দাদা রমাপ্রসাদ। জলহাওয়া পরিবর্তনের জন্য সঙ্গে যেতে হয় শ্যামাপ্রসাদকে দেরাদুনে। সে যাত্রায় স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি বলেই অনুমান।

এর কিছুদিন পর পূজার সময় অসুস্থ হন শ্যামাপ্রসাদের মা যোগমায়া দেবী। অসুস্থতা এমন পর্যায়ে যায় যে, বন্ধ করে নিতে হয় বাড়ির দুর্গাপূজাও।

এই সব কিছু মিটে যাওয়ার পর মনে হলো বইছে কিছু সুবাতাস। সেই বড়দিনের ছুটিতে সকলে মিলে গেলেন মধুপুর। বলা যায়, সেটাই ছিল বিয়ের পর শ্যামাপ্রসাদ-সুধাদেবীর মধুচন্দ্রিমা বা হানিমুন। তবে সেটা এখনকার মতো কেবল যুগলে নয়, বরং পরিবারের সকলের সঙ্গে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে থাকা বা সময় কাটানোর সুযোগ থাকে না। কেবল জায়গাই বদল হয়, বাকি সবই কলকাতার মতোই— খাড়া-বড়ি-থোড়।

এই যাত্রাও কিন্তু শেষপর্যন্ত সুখের হয় না। শ্যামাপ্রসাদের নিজের কথায়, "কদিন খুব আমোদে কাটল। হঠাৎ বুড়ার জ্বর হলো। একটু বাঁকা রকমের জ্বর। তাকে নিয়ে সবাই আমরা ১ জানুয়ারি কলকাতা চললাম দুপুরের এক্সপ্রেসে। সঙ্গে ডাক্তার। পথে আসানসোল আসবার আগে দিদির হঠাৎ পেটে ব্যথা শুরু হলো— অসহ্য যন্ত্রণা। আমরা আসানসোলে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। মন বড়ো খারাপ হয়ে গেল তার কষ্ট দেখে। কলকাতায় পৌঁছে সে কী কাণ্ড! দোতলায় বড়ো ঘরে দিদিকে রাখা হলো। তার পাশের ঘরে বুড়া। দিদির অসুখ বেড়েই চলল। ডাক্তার সবাই এলেন। কেউ কিছু করতে পারলেন না। ৫ জানুয়ারি ভোরে সব শেষ।"

আশুতোষ ছিলেন তাঁর এই মেয়ে অন্তপ্রাণ। সেই মেয়ের এই অকালমৃত্যু সহ্য করতে পারলেন না তিনি। এক বছরের মাথায় ১৯২৪ সালের ২৫ মে পাটনায় মারা গেলেন তিনি। পর পর এই দুই ঘটনায় মুখোপাধ্যায় পরিবারে উঠল ঝড়। সব দায়িত্ব তখন কার্যত এসে পড়ল শ্যামাপ্রসাদের কাঁধে।

আশুতোষের মৃত্যুর আগের বছর অর্থাৎ ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে শ্যামাপ্রসাদ বাংলায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এমএ পাশ করেন। ১৯২৪-এ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন প্রথম হয়ে। শুরু হয় কর্মজীবন।

এমএ পাশ করার আগে থেকেই বাবা আশুতোষকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা কাজে সাহায্য করতেন শ্যামাপ্রসাদ। তাই আশুতোষের মৃত্যুতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেটে যে শূন্যতা তৈরি হয় তা পূরণ করার জন্য শ্যামাপ্রসাদকেই ওই দুইয়ের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করা হয় ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দেই। ১৯২৬-এ তিনি কেমব্রিজে যান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় বিধান পরিষদে জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন। পরের বছর ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মতোই বিধান পরিষদের সদস্যপদে ইস্তফা দেন। কিন্তু কংগ্রেসের ওই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত না হওয়ার কারণে পুনর্নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে জয়ী হন ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে। ওইসঙ্গে চলতে থাকে তাঁর আইনব্যবসাও। ফলে স্ত্রী বা পরিবারকে দেওয়ার মতো সময় তাঁর হাতে প্রায় থাকতই না।

বাবার মৃত্যুর একমাস আগে ১৯২৪-এর ২৪ এপ্রিল শ্যামাপ্রসাদের প্রথম ছেলে সন্তু বা অনুতোষের জন্ম। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীকে তিনি এসময় ঠিকমতো সঙ্গ দিতে পারেননি। কিন্তু তা নিয়ে তাঁর স্ত্রী সুধাদেবীর কোনো অভিযোগ ছিল না। বরং স্বামীকে তিনি তাঁর কাজে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সবসময় অনুপ্রাণিত করতেন।

শ্যামাপ্রসাদের সমব্যথী হয়ে তাঁর কাজের পথে প্রবলভাবে সাহায্য করার কারণে স্ত্রীর প্রতি শ্যামাপ্রসাদের ভালোবাসা বা অনুরাগ কেবল বেড়েছিল তা নয়, সেই সঙ্গে মনে মনে স্ত্রীর কাছে একরকম কৃতজ্ঞও থাকতেন তিনি। সুধাদেবী সেই সময় পিতৃহীন শ্যামাপ্রসাদের শোক এবং এক ধরনের নিঃসঙ্গতা দূর করে সর্বার্থেই তাঁর হৃদয়-পাত্রকে অমৃত সুধায় ভরিয়ে তোলেন। আর এসবের মধ্য দিয়েই মনের দিক থেকে দু'টি হৃদয় যেন আরও কাছাকাছি আসে।

শ্যামাপ্রসাদ তখন বাইরের কাজ নিয়েই অতি ব্যস্ত। এদিকে সুধা দেবী ঘরের কাজ সামলান বড়ো জা তারাদেবীর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে। সেই সময় প্রকৃত অর্থেই তারাদেবীও দিদির মতোই আগলে রাখতেন সুধাদেবীকে।

১৯২৪-এর পর থেকে ১৯৩৩-এর মধ্যে সুধাদেবী পাঁচ সন্তানের মা হন। এর মধ্যে সবচেয়ে ছোটো ছেলেটি জন্মের অল্পদিনের মধ্যে ডিপথিরিয়ায় প্রাণ হারায়। পুত্রশোক সুধাদেবী ঠিক সামলাতে পারেন না। ডবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন তিনি। রোগের সেই আক্রমণের মোকাবিলা করার মতো শক্তি সুধা দেবীর ছিল না। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দেই চার ছেলে-মেয়ে ও স্বামীকে রেখে শেষনিশ্বাস

ফেলেন তিনি। সুধাদেবীর মৃত্যু শ্যামাপ্রসাদের জীবনে মধ্যাহ্নেই সূর্য অস্ত যাওয়ার মতো একটা মর্মান্তিক ব্যাপার হয়ে ওঠে।

সেদিনের সেই মর্মান্তিক ঘটনার শেষ মুহূর্তটি বাঙ্ময় হয়ে আছে শ্যামাপ্রসাদ-অনুজ উমাপ্রসাদের অল্প কয়েকটি কথার আঁচড়ে। তিনি লিখেছেন,— ‘‘এখনও মনে আছে, সেই রাত্রে শ্মশানঘাটে আমরা পাশাপাশি বসে, চিতার ওপর শায়িত সেই লক্ষ্মীপ্রতিম মরদেহ। সিঁথিভরা টকটকে লাল চওড়া সিঁদুর। নয় বছরের পুত্র মুখাগ্নি করেছে। দাউ দাউ করে চিতা জ্বলে উঠছে। প্রস্তরমূর্তির মতো সেজদা নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে বসে, নিষ্পলক চোখে সেদিকে চেয়ে। হঠাৎ কানে এল তাঁর অস্ফুট স্বগতোক্তি— ‘কী সর্বনাশই না হয়ে গেল!’...’’ (মুখপত্র ও ঘরোয়া কাহিনি শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরি ও মৃত্যুপ্রসঙ্গ। পৃ. ১৫)

স্ত্রী যখন মারা যান তখন শ্যামাপ্রসাদের বয়স মাত্র বত্রিশ। এগারো বছর আগে বিয়ের সময় শ্যামাপ্রসাদের বয়স ছিল বাইশ। জীবনে তাঁর সেই প্রথম এবং শেষ প্রেম। কিশোরী বধূকে ভালোবেসেছিলেন তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে। সে ভালোবাসায় কোনো খাদ ছিল না। সুধা দেবীর জীবনেও শ্যামাপ্রসাদই ছিলেন সব। তাঁকে ঘিরেই কামনার ফুলগুলি ফুটছিল এক-এক করে। ব্যস্ত স্বামীকে সব সময় কাছে না পেলেও তাঁর সমস্ত কিছুর দিকেই ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ নজর। সব কিছু গুছিয়ে রাখতেন একবারে তাঁর হাতের নাগালে। আর ছিল অনুপ্রেরণা।

সব সময় সুধাদেবী বলতেন, তুমি তোমার কাজ নিয়ে এগিয়ে যাও। অন্য কিছু ভাবার দরকার নেই। সব সময় জেনো আমি আছি তোমার পাশেই। তোমার সব কাজের প্রতিই রয়েছে আমার সায়।

এটাই ছিল শ্যামাপ্রসাদের সমস্ত শক্তির প্রধান উৎস। স্ত্রীর ভালোবাসা, বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা ভরে দিয়েছিল তাঁর জীবনপাত্র। সে কারণেই সবকিছু ভুলে তিনি মনপ্রাণ দিয়ে পড়াশোনা করেছেন। সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন এমএ এবং আইন পরীক্ষায়।

স্ত্রীর সেই ভালোবাসার ওপর ভর করেই বিয়ের চার বছরের মাথায় তিনি বিলেতে গেছেন ব্যারিস্টারি পড়তে একাই। তখনও সব সময় মনে পড়ত স্ত্রীর কথা। তাঁর মুখে হাসি ফোটানোর জন্যই ব্যারিস্টারি পড়েন প্রাণ দিয়ে। সফলও হন অন্যান্য সব পরীক্ষার মতোই।

স্ত্রীর এই ভালোবাসা আর বিশ্বাসের কারণেই তাঁকে নিয়ে ছিল শ্যামাপ্রসাদের অনেক স্বপ্ন। কিছু বিধি বাম। প্রাণসমা স্ত্রীকে তিনি হারালেন ভরাযৌবনেই। এই যে বিচ্ছেদ সেটা বিঁধেছিল তাঁর হৃদয়ে সেসময় কিন্তু বাইরে তাঁর প্রকাশ ছিল না। নিজের সব বেদনায় হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করেও করে গেছেন কাজ। নীরবে। যথাযথভাবে।

তাঁর নিজের কথায়, ‘সে যাবার পর যে ভাবে আঘাত পেয়েছিলাম তা ভুলতে পারি না। বাইরে শোক চেপে রাখার ক্ষমতা আছে। যেদিন তার মুখাগ্নির জন্য সন্তুকে সঙ্গে নিয়ে শ্মশানে গিয়েছিলাম, তার পরদিন কলেজে গিয়েছি, কোর্টে গিয়েছি, সব কাজও করেছি। কিন্তু এটা বলা ভুল হবে যে মনে তখন শোকাগ্নি জ্বলছিল না। যে অভাব তখন হয়েছিল— সেটা দৈহিকের চেয়ে মানসিক বেশি। মন এতই নির্ভরশীল যে বিনা অবলম্বনে মনস্থির করতে পারি না। পুনরায় বিবাহ করার কথা মনে আনিনি— শুধু তাকে ভালোবাসতাম বলে নয়। আমার ছেলে-মেয়েদের আমি বুকের সঙ্গে মিলিয়ে রেখেছি। তারা যাতে কোনোভাবে মায়ের অভাব না বোধ করে, এটা আমার বড়ো দায়িত্ব ছিল। নতুন কোনো মানুষ বাড়িতে তাদের মায়ের স্থান দখল করলে শুধু তাদের মানসিক আঘাত যে প্রবল হতো তা নয়, তার আগমনে হয়তো এমন সব সমস্যা সৃষ্টি হতো যার সমাধান করতে আমাদের ঘোর অশান্তির মধ্যে ডুবতে হতো।’ (শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরি ও মৃত্যুপ্রসঙ্গ। পৃ. ৪৯)।

শ্যামাপ্রসাদ বিশ্বাসী ছিলেন নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ কর্মসাধনায়। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সংসারে মানুষ দুঃখ পায় ‘আমি’ আর ‘আমার’ এই দু’য়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণে। তাঁর আজন্মলালিত বিশ্বাস ছিল ‘‘সব কাজ করান শ্রীভগবান। আমি নিমিত্ত মাত্র।

এই হলেন শ্যামাপ্রসাদ। অকপট। কর্তব্যনিষ্ঠ। দৈহিক সুখের প্রত্যাশী তিনি কোনো সময়েই ছিলেন না। তিনি স্ত্রীকে পাশে চেয়েছিলেন অনেকটা সখী ও সচিবের মতো, যে তাঁকে বুঝবে। আন্তরিক শুভকামনা দিয়ে তাঁকে বেঁধে রাখবে। কর্মপথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা জোগাবে। স্ত্রী সুধার মধ্যে তিনি এসবই পেয়েছিলেন। পেয়েছিলেন বলেই তার জায়গায় আর কাউকে বসাতে পারেননি। কেবল বাস্তববোধ নয়, এক ধরনের আন্তরিক বিশ্বাসের কারণেও।

শ্যামাপ্রসাদ বিশ্বাসী ছিলেন নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ কর্মসাধনায়। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সংসারে মানুষ দুঃখ পায় ‘আমি’ আর ‘আমার’ এই দু’য়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণে। তাঁর আজন্মলালিত বিশ্বাস ছিল ‘‘সব কাজ করান শ্রীভগবান। আমি নিমিত্ত, কাজ তাঁর করতেই হবে— আজ আমাকে দিয়ে, কাল অন্যকে দিয়ে। যখন আমাকে দিয়ে করাবেন, তখন আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব এবং সেই কাজ যতটা সম্ভব ভালোভাবে করতে চেষ্টা করব। সেখানে ফাঁকি দেব না বা অযত্ন করব না। ফল পাব কী পাব না এটা তুচ্ছ কথা। চেষ্টা করব তাঁরই নির্ধারিত পথে চলতে। যদি ফল পাই, আমার সাধন পরিপূর্ণতা লাভ করল বুঝব। যদি ফল না পাই, আমার কোনো ত্রুটি হয়েছে, এই ধরব। ...সবচেয়ে বড়ো কথা হলো— আমিত্ব ভাবকে ছাড়তে হবে— তা না হলে শান্তি নেই’ (ওই, পৃ. ৫০-৫১)।

এটাই ছিল শ্যামাপ্রসাদের জীবনবেদ। স্বাভাবিক ধারায়, পিতৃভক্ত শ্যামাপ্রসাদের তো শিক্ষাজগতেই ব্যস্ত থাকার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর জীবনদেবতাই তাঁকে রাজনীতির অঙ্গনে টেনে এনেছেন— এনেছেন তাঁকে বাঙ্গালির পরিত্রাতার দায়িত্ব পালনের জন্য। শ্যামাপ্রসাদ জানতেন এবং মানতেন সে কথা। আর তাই নম্রভাবে নতমস্তকে তাঁর সেই ইচ্ছাকে মান্যতা দিয়ে তিনি হয়েছেন ভারতকেশরী। বিধির বিধান মেনেই উৎসর্গ করেন নিজের জীবনকে দেশের জন্য— মানুষের জন্য। সুধার প্রতি প্রেমই পরিণত হয় বঙ্গপ্রেমে— ভারতপ্রেমে— মানবপ্রেমে। □

With Best Compliments

From -

A

Well Wisher

বাংলা পরিভাষা নির্মাণ, বানান সংস্কার এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি

বাংলা বানানের সর্বজনগ্রাহ্য রীতি ও বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি বিদ্যাচর্চার অপরিহার্য দিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লেখেন— 'বাংলা ভাষায় প্রচলিত শব্দ সমূহের মধ্যে যেগুলি সংস্কৃত ভাষা হইতে অপরিবর্তিত ভাবে আসিয়াছে তাহাদের বানান প্রায় সুনির্দিষ্ট। কিন্তু যে সকল শব্দ সংস্কৃত নহে, অর্থাৎ যেগুলি দেশজ বা অজ্ঞাতমূল, বিদেশাগত অথবা সংস্কৃত বা বিদেশি শব্দের অপভ্রংশ, তাহাদের বানানে বহুস্থলে বিভিন্নতা দেখা যায়। ইহার ফলে লেখক, পাঠক, শিক্ষক ও ছাত্র সকলকেই কিছু কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বাংলা বানানের একটা বহুজনগ্রাহ্য নিয়ম দশ-বিশ বৎসরের মধ্যে যে আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিবে এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বাংলা ভাষার লেখকগণের মধ্যে যাঁহারা শীর্ষস্থানীয় তাঁহাদের সকলের বানানের রীতিও এক নহে। সুতরাং মহাজন অনুসৃত পন্থা কোনটি তাহা সাধারণের বুঝিবার উপায় নাই।'

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নির্মাণ এবং বানান সংস্কার করা একেবারেই সহজ ছিল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রবর্তনে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা অনবদ্য। স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগে তিনিই দীনেশচন্দ্র সেনকে অধ্যাপক হিসেবে আনেন। 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ' তিনিই প্রবর্তন করেন। দীনেশচন্দ্র ছিলেন এই ফেলোশিপের প্রথম ও শেষ প্রাপক। ১৯৩২-এ দীনেশচন্দ্রের অবসরের পর 'রামতনু লাহিড়ী ফেলোশিপ'টি রূপান্তরিত হলো 'রামতনু লাহিড়ী প্রফেসর' পদে। এই পদে প্রথম আসীন হন খগেন্দ্রনাথ মিশ্র। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলা ভাষা সাহিত্যের উন্নতির জন্য ১৯৩২ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিতে পাওয়া যায় , "Dr. Rabindranath Tagore was invited to accept an engagement with the University for two years with effect from the 1st August,1932, for delivering a course of lectures each year on selected topics connected with Bengali Language and literature for the benefit and guidance of Post-graduate students and for co-operating with the University in promoting study and research in Bengali in the University. Dr. Rabindranath Tagore accepted the invitation. Dr. Rabindranath Tagore was recognized as a part-time professor."

অধ্যাপক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ দিলেন দু'টি ভাষণ, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' (ডিসেম্বর, ১৯৩২) ও 'শিক্ষার বিকিরণ' (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩)। প্রবন্ধদ্বয় 'শিক্ষা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হলো। শ্যামাপ্রসাদ তখন উপাচার্য না হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি নির্ধারণে নির্ণায়ক ভূমিকা তাঁর। কবি এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে প্রস্তাব করেন বাংলা বানানের মধ্যে শৃঙ্খলা আনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে বড়ো ভূমিকা নিতে হবে। একই সঙ্গে বাংলা পরিভাষা রচনার কথাও বলেন। শ্যামাপ্রসাদ শুধু সে প্রস্তাব গ্রহণ করেননি, একই সঙ্গে কবিকে অনুরোধ করলেন এ বিষয়ে প্রাথমিক পরিকল্পনা দিতে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবে সম্মত হলে তাঁকে সহায়তা করার জন্য শ্যামাপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা সহায়কের (Research Assistant) পদও সৃষ্টি করেন। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য হলেন সেই সহায়ক।

পরবর্তীকালে পরিভাষার কাজকে আরও দ্রুত করার জন্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। রাজশেখর বসু হলেন সভাপতি, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে সম্পাদক নির্বাচন করা হলো। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য সদস্যরা হলেন ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, প্রমথনাথ বিশী, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য প্রমুখ। সমিতি যে সব বিষয়ে পরিভাষা তৈরি করতে চাইলেন, তা হলো পদার্থবিদ্যা, গণিত, রসায়ন শাস্ত্র, প্রাণীবিদ্যা, শারীরতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, স্বাস্থ্যবিদ্যা, দর্শন, মনোবিদ্যা, ভূগোল, চিত্রাঙ্কন, কান্তিবিদ্যা, অর্থনীতি ও বাণিজ্য।

প্রত্যেক বিভাগ নানা অসুবিধার মধ্যে কাজ করেছিল। অবৈতনিক এই কাজে নানা কৃতবিদ্য মানুষ যুক্ত হয়েছিলেন, ডঃ মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও আন্তরিকতা তাঁদের এই কাজে উদ্বুদ্ধ করে। বিভাগীয় সমিতিগুলি কেন্দ্রীয় সমিতির সঙ্গে যাতে সঠিক যোগসূত্র রাখে সে ব্যাপারে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের ছিল অতন্ত্র সতর্কতা। যখন যে বিভাগ কাজ শেষ করেছে সেই কাজ পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে প্রায় সকল বিভাগ পরিভাষার প্রাথমিক কাজ শেষ করে।

শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন স্বাদেশিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ। তিনি চেয়েছিলেন মাতৃভাষায় পড়ানো হোক নানা বিষয়। কিছু মানুষ পাশ্চাত্য শিক্ষায় গর্বিত হয়ে মনে করলেন বিজ্ঞান কখনোই মাতৃভাষায় পড়ানো যায় না। শ্যামাপ্রসাদ সেই সব বাধা সরিয়ে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান পাঠের আয়োজন করেন। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু যথার্থই বলেছিলেন

ফঃ ৫

With Best Compliments
From-

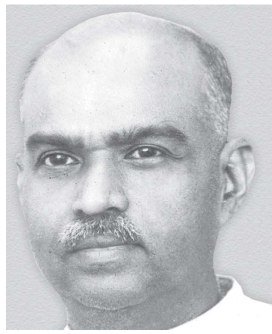

পীযূষ কানোরিয়া

বিজেপি বিধায়ক

বিধানসভা কেন্দ্র ২১৫, রাজারহাট নিউটাউন

SHREE JAIN VIDYALAYA

Educational institution in Howrah, West Bengal

Address

25/1, Bonbehari Bose Road, Sandhya Bazar,
Choura Bustee, Shibpur, Howrah, West Bengal- 711101
Phone - 033-22426369

যে, যাঁরা বলেন মাতৃভাষায় বিজ্ঞান পাঠ করা যায় না, তাঁরা হয় মাতৃভাষা জানেন না, নয় বিজ্ঞান জানেন না। শুধু বিজ্ঞান নয়, হিউম্যানিটিজ শাখার অন্তর্গত নানা বিষয়ও বাংলায় পড়ানোর ব্যবস্থা করলেন শ্যামাপ্রসাদ। এ জন্যই পরিভাষা নির্মাণ ও বানান সংস্করণ প্রয়োজনীয় হয়।

কেন্দ্রীয় পরিভাষা সমিতির সঙ্গে বানান সংস্কার সমিতির কিছু পার্থক্য ছিল। পরিভাষার কাজ যত সহজে হচ্ছিল, বানানের কাজ মোটেই তত সহজ ছিল না। বানান সংস্কার নিয়ে স্বভাবতই নানা বিতর্ক আসে। ইতিমধ্যে শ্যামাপ্রসাদ উপাচার্য হয়েছেন। বানান সংস্কারে তাঁর অপরিসীম উদ্যোগ, আর সমর্থনে আছেন স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে ঈর্ষা করতেন তাঁরা এই সুযোগে রবীন্দ্রনাথকে কুৎসিত আক্রমণ করতেও দ্বিধা করলেন না। শ্যামাপ্রসাদ কিন্তু সামনে থেকে এই সংস্কারে নেতৃত্ব দিলেন। 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকায় তিনি লেখেন—

'কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ চলিত বাংলা ভাষার বানানের নীতি নির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন। গত নভেম্বর (১৯৩৫ সালে) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম সংকলনের জন্য একটি সমিতি গঠিত করেন। সমিতিকে ভার দেওয়া হয় যে সকল বানানের মধ্যে ঐক্য নাই সে সকল যথাসম্ভব নির্দিষ্ট করা এবং যদি বাধা না থাকে তবে কোনো কোনো স্থলে প্রচলিত বানান সংস্কার করা।'

বানান সংস্কার সমিতি নিবিড় আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করেন। তার কয়েকটি এ রকম—

(১) রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব। দ্বিত্ব যদি বর্জন করা যায় তাহলে লেখা ও ছাপা সহজ হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বিত্বযুক্ত ও দ্বিত্ব বর্জিত দুই রূপ গ্রহণ যোগ্য। হিন্দি বা মারাঠীতে দ্বিত্ব দেওয়া হয় না। প্রশ্ন হলো— বাংলা ভাষাতে দ্বিত্ব বর্জন করা যাবে কি না?

(২) সন্ধির ক্ষেত্রে ঙ এবং অনুস্বারের মধ্যে কেবল অনুস্বার ব্যবহার করলে কোনো অসুবিধা কি রয়েছে?

(৩) মনঃ, ক্রমশঃ ইত্যাদি বিসর্গান্ত সংস্কৃত শব্দের বাংলা বানানে কোথাও বিসর্গ থাকে না। সবক্ষেত্রে বিসর্গ লোপ করা যাবে কি না?

(৪) দিক্, সম্রাট প্রভৃতি শব্দের শেষে হস্ চিহ্ন রাখা আবশ্যক কি না?

(৫) অনুস্বার, ঙ এবং ঈ-এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী নিয়ম? অর্থাৎ রং না রঙ, বাংলা না বাঙলা ইত্যাদি।

(৬) Club– bus– circus– focus প্রভৃতি শব্দের বাংলা বানানে বর্ণের উচ্চারণ বাংলায় কোন অক্ষরের সাহায্যে হবে?

এরকম অনেক প্রশ্ন বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকদের কাছে প্রেরিত হয়। যে উত্তরগুলি আসে তাতে দেখা গেল বেশকিছু ক্ষেত্রে সহমত রয়েছে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মতপার্থক্য দেখা গেল। তবে অনেকক্ষেত্রে সামান্য পরিবর্তনের সাহায্যে বাংলা বানান সহজ করার পক্ষে অনেকে পরামর্শ দিলেন। নানা আলাপ আলোচনার পর সমিতি একটি সিদ্ধান্তে আসেন। এ প্রসঙ্গে 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার ভূমিকায় শ্যামাপ্রসাদ লেখেন—

'যাঁহাদের অভিমত সংগৃহীত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে যেরূপ কতকগুলি বিষয়ে মতভেদ আছে, সেইরূপ মতভেদ সমিতির সদস্যগণের মধ্যে আছে। বিভিন্ন পক্ষের যুক্তি বিচারের পর সদস্যগণের মধ্যে যতটা মতৈক্য ঘটিয়াছে তদনুসারেই বানানের প্রত্যেক বিধি রচিত হইয়াছে।'

রাজনীতিক, সমাজসেবী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে অত্যন্ত সফল। মাতৃভাষায় যাতে শিক্ষা লাভ করা যায় সেজন্য পণ্ডিত অধ্যাপকদের কাছে পাণ্ডুলিপি আহ্বান করেছেন। তাঁর উদ্যোগেই সুকুমার সেনের 'বাংলার সাহিত্যের কথা', সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'অশোক', অসিত হালদারের 'ভারতীয় শিল্পকলা', 'ইউরোপীয় শিল্পকলা' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। উপাচার্য হিসেবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পিতা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মতো উজ্জ্বল এক শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাই 'বাপ কা বেটা' শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। ১৯৩৭ সালে উপাচার্য হিসেবে কার্যভার নিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করলে কবি বাংলাতে বক্তৃতা করতে চান। প্রথাভাঙা এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে শ্যামাপ্রসাদ বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধাই প্রকাশ করেছিলেন। সেদিনের সমাবর্তনে উপাধি প্রাপকেরা পোশাক ব্যবহারেও অভিনবত্ব দেখিয়েছিলেন। বাঙ্গালি ছাত্ররা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে সম্মান গ্রহণ করেছিলেন। এভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করেছিলেন তিনি।

এসব বলার কারণ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী শ্যামাপ্রসাদের গভীর অনুরাগ। তিনি জানতেন পরিভাষা ও বানান সংস্কার তখনই বাস্তব সম্মত হবে, যদি রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্বের সমর্থন মেলে। কবিগুরু তাঁকে হতাশ করেননি। সমাবর্তনে রবীন্দ্রনাথ স্যার আশুতোষের অনবদ্য অবদানের উল্লেখ করে বলেন, 'পিতৃনির্দিষ্ট সেই পথকে আজ প্রশস্ত করে দিচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র বাংলাদেশের আশীর্ভাজন শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ।'

শ্যামাপ্রসাদের উদ্যোগে যে পরিভাষা নির্মাণ ও বাংলা বানান সংস্কারের বিপুল কর্মযজ্ঞ চলছিল তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন কবি। 'বাংলা বানানের নিয়ম'-শীর্ষক পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর করা অনুমোদন পত্রটি হলো— 'বাংলা বানান সম্বন্ধে যে নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন আমি তাহা পালন করিতে সম্মত আছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬।'

রবীন্দ্রনাথের পর স্বাক্ষর করেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনাবলী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত বানান দ্বারা রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের মতো অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে রাজি করানোর জন্য যে মেধা, দূরদর্শিতা ও ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন তা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পুরো মাত্রায় ছিল। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বঙ্গ বিভাগ করে শুধু বাঙ্গালিকে রক্ষা করেননি, বাংলা পরিভাষা নির্মাণ ও বানান সংস্কার করে বাংলা ভাষার সীমাহীন উন্নতি করেছেন। □

LUXMI TEA CO. PRIVATE LIMITED

17, R. N. Mukherjee Road, Kishore Bhawan, Kolkata-700 001
Phone No. 2248 4437/4227, Fax No. 2243 0177
E-mail : pulakchow01@gmail.com Web.: www.luxmigroup.in

GROUP GARDENS

NARAYANPUR T.E.
SHYAMGURI T.E.
MONMOHINIPUR T.E.
MANOBAG T.E.
BHUYANKHAT T.E.
MANU VALLEY T.E.
GOLOKPUR T.E.
PEARACHERRA T.E.
JAGANNATHPUR T.E.
SAROJINI T.E.
FULBARI T.E.
URRUNABUND T.E.
MAKAIBARI T.E.
KENDUGURI T.E.
MORAN T.E.
SEPON T.E.
ATTABARIE T.E.
LEPTKATTA T.E.
ADDABARI T.E.
DIRAI T.E.
MAHAKALI T.E.

CAPITAL TRANSPORT CORPN. OF INDIA

H.O.

25, Gangadhar Babu Lane, Kolkata - 700 012 Phone : 2215-4312, 2236-0713

Branches:

Aligarh I Mumbai * Delhi I Durgapur * Hyderabad I Chennai * Vezianagaram

BRITANNIA GLASS CO.

7, Swallow Lane, Kolkata - 700 001, (W. B.) India
Ph. - 0091-33-2210 4275 / 2230 5837 / 4064 5951
E-mail : gautam.ge@mail.com
britanniaglass@rediffmail.com

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও মেদিনীপুর
রাজনীতি, জাতীয়তা এবং বঙ্গীয় সমাজ

ড. শুভদীপ গঙ্গোপাধ্যায়

আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক ইতিহাসে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এক স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে রয়েছেন। একজন শিক্ষাবিদ, জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ, সংসদ সদস্য এবং ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় রাজনীতির গতিপথকে বহুলাংশে প্রভাবিত ও রূপায়িত করেছিলেন। যদিও তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড মূলত কলকাতা এবং সর্বভারতীয় রাজনীতিতেই কেন্দ্রীভূত ছিল, তবুও মেদিনীপুর জেলাটি (বর্তমানে পূর্ব, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম) সেইসব রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল, যা তাঁর আদর্শগত ও প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের শেষপর্বে বিশেষ করে ভারত ছাড়ো আন্দোলন, বঙ্গের মন্বন্তর এবং দেশভাগের প্রাক্কালে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের সময় মেদিনীপুর ছিল বঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জেলা। তাই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং সেই সময়কে তিনটি প্রধান মাত্রার নিরিখে অনুধাবন করা যেতে পারে— জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এই জেলার ভূমিকা; বঙ্গের মন্বন্তরের ফলে সৃষ্ট মানবিক সংকট; এবং বঙ্গে হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উত্থান। ১৯৪০-এর দশকে বঙ্গের শাসনব্যবস্থা, জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক ও আলোচনা চলছিল, মেদিনীপুরের বিপ্লবী ঐতিহ্য এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সেগুলিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

মেদিনীপুরকে ঔপনিবেশিক-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করা হতো। বিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্ব থেকেই এই জেলায় বিপ্লবী জাতীয়তাবোধ, স্বদেশী আন্দোলন এবং কৃষক আন্দোলন বিকাশের এক উর্বর ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিল। ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'-এর সময় এই জেলাটি বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে; সেই সময়ে তমলুক ও কাঁথির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের অধীনে এক সমান্তরাল জাতীয়তাবাদী শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। মেদিনীপুরে ব্রিটিশ সরকারের দমনপীড়ন ছিল অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম; এর অন্তর্ভুক্ত ছিল পুলিশের নৃশংসতা, নির্বিচার গ্রেপ্তার এবং উপকূলীয় অঞ্চলে কার্যকর করা বিতর্কিত 'পোড়ামাটি নীতি'।

এই সময়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভায় অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। মেদিনীপুরে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত দমনমূলক প্রশাসনিক পদক্ষেপগুলোর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন তিনি। পাশাপাশি, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে গভর্নরের অত্যধিক হস্তক্ষেপেরও তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবন নিয়ে রচিত ঐতিহাসিক গবেষণাসমূহ থেকে জানা যায় যে, 'আগস্ট আন্দোলন'-এর সময় মেদিনীপুরে সংঘটিত দমন পীড়নের ঘটনাটি ব্রিটিশ প্রশাসন সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

এই জেলার বিপ্লবী ঐতিহ্য বঙ্গের সামগ্রিক জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশেও এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। মেদিনীপুর বহু মনীষী ও সমাজ-সংস্কারকের জন্ম দিয়েছে, যাঁদের চিন্তাধারা বঙ্গের রাজনৈতিক ভাবধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। রাজনারায়ণ বসুর মতো ব্যক্তিত্বদের দ্বারা গড়ে ওঠা শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক পরিবেশটিই পরবর্তীকালে বাঙ্গালি জাতীয়তার সেই বৃহত্তর আদর্শগত ভিত্তির অংশ হয়ে ওঠে, যা পরবর্তীতে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব বৌদ্ধিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল।

১৯৪৩ সালের বঙ্গের দুর্ভিক্ষ অন্যান্য অনেক জেলার তুলনায় মেদিনীপুরকে অধিকতর তীব্রভাবে বিধ্বস্ত করেছিল। উপকূলবর্তী মেদিনীপুর একই সময়ে খাদ্যসংকট, ঘূর্ণিঝড়, প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলার মতো বহুমুখী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। হিন্দু

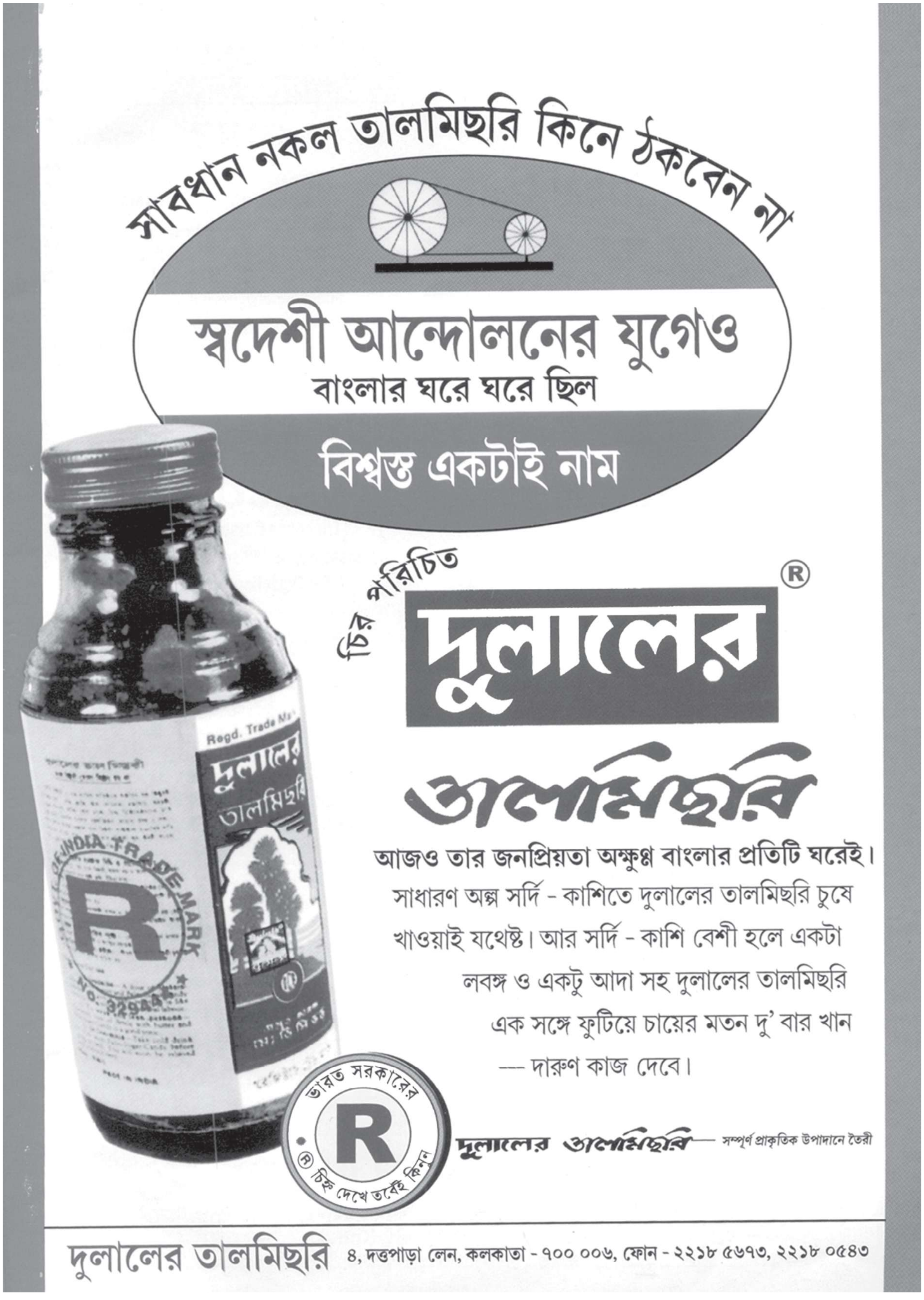
সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না
স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম
চির পরিচিত
দুলালের
তালমিছরি
আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
— দারুণ কাজ দেবে।
ভারত সরকারের
R
চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

মহাসভা-সহ বিভিন্ন সংগঠনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল এই ত্রাণকার্য পরিচালনা।

অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি হিসেবে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বঙ্গ জুড়ে তাঁর সংগঠন পরিচালিত দুর্ভিক্ষ ত্রাণকার্যগুলোর সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। সমসাময়িক প্রতিবেদন এবং পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক আলোচনাগুলো থেকে জানা যায় যে, কাঁথি মহকুমার ত্রাণশিবির ও হাসপাতালগুলোতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভাবমূর্তি ও নেতৃত্বকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছিল। পরবর্তী আলোচনাগুলোতে উদ্ধৃত একটি সমসাময়িক বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে মেদিনীপুরের ত্রাণশিবিরতে কীভাবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতি বা ছবি টাঙিয়ে রাখা হতো।

এই কর্মকাণ্ডগুলির মধ্য দিয়ে ইংরেজদের একদিকে যেমন মানবিক উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে রাজনৈতিক সংহতি বা জনসমাবেশের প্রচেষ্টাও প্রতিফলিত হয়েছিল। দুর্ভিক্ষটি বিভিন্ন আদর্শ-ভিত্তিক সংগঠনগুলোর সামনে দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মাঝে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল। ঐতিহাসিকরা অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, হিন্দু মহাসভা মেদিনীপুর-সহ বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ত্রাণকার্য পরিচালনার মাধ্যমে হিন্দু রাজনৈতিক সত্তাকে সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। সুতরাং এই দুর্ভিক্ষটি কেবল একটি মানবিক বিপর্যয়ই ছিল না, বরং বঙ্গের রাজনৈতিক মেরুকরণের ক্ষেত্রে এটি একটি যুগান্তকারী বাঁক হিসেবেও পরিগণিত হয়েছিল।

একই সময়ে, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দুর্ভিক্ষ নিরসনে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন এবং সরকারের গৃহীত ত্রাণব্যবস্থাগুলোর অপর্যাপ্ততার কঠোর নিন্দা জানিয়েছিলেন। এই সময়ের তাঁর বক্তৃতা ও লেখনীতে প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা এবং সংগঠিত জন-হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

বঙ্গ বিভাগকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিতর্ক ও আলোচনার প্রেক্ষাপটে মেদিনীপুরের রাজনৈতিক গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। মুসলিম লিগের একাংশ এবং বঙ্গের কতিপয় নেতার সমর্থিত 'স্বাধীন যুক্তবঙ্গ' গঠনের প্রস্তাবটির অন্যতম প্রবল বিরোধী হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। তিনি জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন যে, বাঙ্গালি হিন্দুদের রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়া এবং জেহাদি হিংসার হাত থেকে রক্ষা করার স্বার্থেই বঙ্গ বিভাজন অপরিহার্য।

পরবর্তীতে তাঁর তৈরি করা শক্ত জমির উপরে প্রথম লোকসভা নির্বাচনে (১৯৫২ সালে) অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা থেকে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে শ্যামাপ্রাসাদের সঙ্গে (দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ) লোকসভাতে প্রতিনিধিত্ব করেন। শুধু তাই নয়, প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে জনসঙ্ঘের যে নয়জন বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁর মধ্যে সিংহভাগই মেদিনীপুর জেলা থেকে। তাঁরা হলেন নৃপেন্দ্রগোপাল মিত্র (বিনপুর), মদনমোহন খাঁ (ঝাড়গ্রাম), কৃষ্ণচন্দ্র শতপতি (নারায়ণগড়), পুলিনবিহারী মাইতি (পিংলা), জ্ঞানেন্দ্রকুমার চৌধুরী (দাঁতন), জনার্দন সাহু (পটাশপুর), বসন্তকুমার পাণিগ্রাহী (মোহনপুর) ও রামেশ্বর পাণ্ডা (ভগবানপুর)। বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া এই সমস্ত মানুষের কথা আজ স্মরণে ও মননে মন্থন করার সময় এসেছে। ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাওয়া জনসঙ্ঘের প্রাথমিক পর্বের এই মহতী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া সামাজিক দায়িত্ব।

(লেখক বিভাগীয় প্রধান, শারীরবৃত্ত বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলকাতা)

With Best Compliments from-

SUPER SPEED CARRIERS PVT. LTD.

2, Rupchand Roy Street, 3rd Floor, Room No. 309
Kolkata - 700 007 (W. B.)
E-mail : superspeed2009@live.com

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

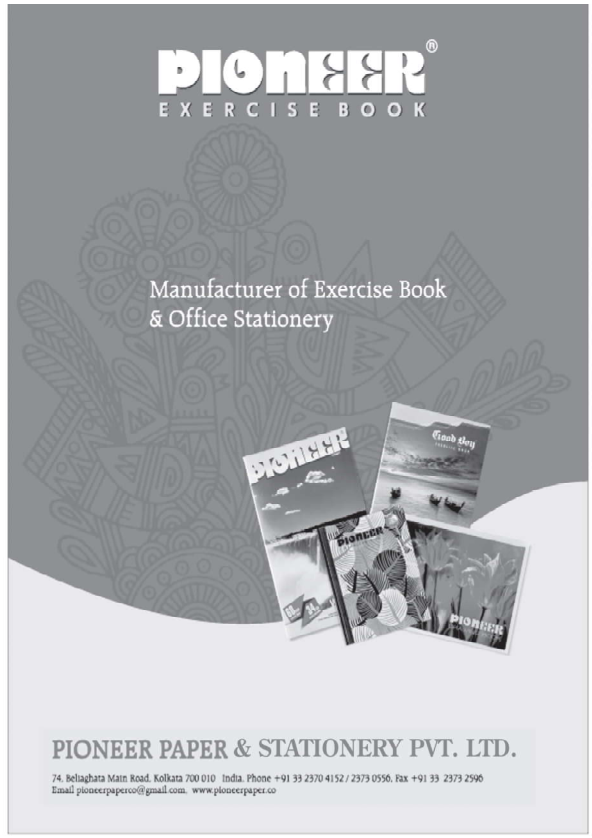

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

★ RETIREMENT PLANNING.
★ CHILDREN EDUCATION FUND.
★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
★ WEALTH CREATION.
★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও কাশ্মীর

ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন ও আত্মবলিদান

ড. তরুণকান্তি চক্রবর্তী

কাশ্মীরের উদ্দেশে হাওড়া স্টেশনে শ্যামাপ্রসাদ (মে, ১৯৫৩)

১৯৫৩ সালের ২৩ জুন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মাত্র ৫৩ বছর বয়সে কাশ্মীরকে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো মর্যাদা দেবার জন্য দেশমাতৃকার বেদীমূলে নিজের প্রাণ বিসর্জন করেন। কাশ্মীরকে কেন তিনি অন্যান্য রাজ্যের মতো মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন, তারজন্য তিনি কী প্রয়াস ও সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, তাই এখানে আলোচ্য বিষয়। সেইসঙ্গে কাশ্মীরের ভারতভুক্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও এখানে আলোচ্য।

দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত খণ্ডিত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম দেশরূপে ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। ৪৯৭টি দেশীয় রাজ্য তখন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মধ্যস্থতায় ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়। কয়েকটি দেশীয় রাজ্য তখন ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। কাশ্মীর সেই রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। কারণ কাশ্মীরের রাজা হরি সিংহের নেহরুর প্রতি বিরাগবশত স্বাধীনভাবে থাকার ভাবনা এসেছিল।

কাশ্মীর রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান ও হিন্দু-মুসলমান জনসংখ্যার ভারসাম্য অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ভিন্ন ছিল। কাশ্মীর পাকিস্তান লাগোয়া পার্বত্য সীমান্তবর্তী দেশীয় রাজ্য। কাশ্মীর উপত্যকা ছিল মুসলমান- সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু জম্মু ছিল হিন্দু- সংখ্যাগরিষ্ঠ। কাশ্মীরের মহারাজা ছিলেন হিন্দু। দেশভাগের পর তিনি কোন দেশের সঙ্গে যুক্ত হবেন— ভারত না পাকিস্তান তা নিয়ে মনস্থির করতে বিফল হলেন। ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশই যোগদানের পক্ষে কিছু শর্ত দিয়েছিল। রাজা হরি সিংহের টালবাহানা দেখে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী মদতে ১৯৪৭ সালের ২২ অক্টোবর কাশ্মীর আক্রমণ করে বসল। তখন রাজা হরি সিংহ উপায়ান্তর না দেখে কাশ্মীর রক্ষা করার জন্য ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইলেন এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্য চাইলেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হওয়ার আগে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেনা হস্তক্ষেপ করা ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ ব্যাপারে ভারত সরকার তাঁকে বোঝালেন। শেষপর্যন্ত ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর কাশ্মীর আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হলো। তারপর ভারত সরকার পাকিস্তানকে প্রতিহত করার জন্য কাশ্মীরে সৈন্যসমাবেশ করার অনুমতি দিল। বিমানে করে কাশ্মীরে সৈন্যসমাবেশ করানো হয় এবং যুদ্ধ শুরু হলো। ভারতীয় সেনা যুদ্ধে যোগদানের পর যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। প্রথমে মহারাজা হরি সিংহের সেনাবাহিনী পাকিস্তানের আক্রমণকে রোধ করতে অপারগ ছিল। কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনী নামার আগেই পাকিস্তান কাশ্মীরের অনেক এলাকা দখল করেছিল। কিন্তু জওহরলাল নেহরুর অদূরদর্শিতার জন্য যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হলো এবং কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ পাকিস্তানের দখলে রয়ে গেল। এই দখলীকৃত এলাকাই আজ 'পাক-অধিকৃত কাশ্মীর' নামে পরিচিত। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট 'দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাক্সেশন' বা ভারতভুক্তি আইনের অধীনে যে মানদণ্ডে অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগুলি যুক্ত হয়েছিল, তা কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ছিল ব্যতিক্রম। ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর কাশ্মীরের ভারতভুক্তি নিয়মাবলী অতিসংক্ষেপে লেখা হল। মাত্র তিনটি বিষয়ে দায়িত্ব হস্তান্তর করা হল ভারত সরকারকে— সামরিক সুরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই তিনটি বিষয় ব্যতীত মহারাজা হরি সিংহ অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের বিষয়গুলি নিজের অধিকারে রাখলেন। ভারতের সংসদ উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে কাশ্মীর সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোনো আইন তৈরি করতে পারত না। ভারতভুক্তি আইনের সপ্তম ধারা অনুযায়ী ভারতের সংবিধানকে কাশ্মীরে প্রয়োগ করাতে বাধ্য করানো যেত না। ওই আইনের অষ্টম ধারা অনুযায়ী কাশ্মীরের কোনো জমি ভারত সরকার কোনো উদ্দেশ্যেই আইন প্রণয়ন করে অধিগ্রহণ করতে পারত না।

ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি আইনের ধারা অনুসারে উভয়ের মধ্যে

With Best Compliments
from

P. C. CHANDRA®
JEWELLERS

A jewel of jewels

pcchandraindia.com | amazon | GET IT ON Google Play Download Now
Follow us on /pcchandrajewellersindia

+918010700400 (Except Sunday)

OUR SHOWROOMS

Bowbazar | Gariahat | Chowringhee | Ultadanga | Golpark | Barasat | Behala | Arambagh
Balurghat | Bankura | Cooch Behar | Katwa | Krishnanagar | Malda | Purulia | Siliguri
Siuri | Tamluk | Agartala

ALL THE BELOW MENTIONED SHOWROOMS WILL REMAIN OPEN ON SUNDAYS

Hatibagan | New Town | Howrah | Serampore | Chandannagar | Sodepur | Habra | Kanchrapara
Baruipur | Barrackpore | Asansol Berhampore | Burdwan | Durgapur | Midnapore | Raiganj | Delhi
Bengaluru (Ulsoor & Koramangala) | Bhubaneswar | Jamshedpur | Noida | Mumbai | Ranchi

সাংবিধানিক সম্পর্ক কীরকম হবে তা নিয়ে ভারতের সংবিধান রচনার সময় প্রশ্ন উঠল এবং ১৯৫২ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং জম্মু-কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লার মধ্যে 'দিল্লি চুক্তি' নামক একটি রাজনৈতিক সমঝোতার দ্বারা একটি বিশেষ ধারা ভারতীয় সংবিধানে যুক্ত করা হলো জম্মু-কাশ্মীরের জন্য। এটিই ছিল ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারা। এই ধারা অনুযায়ী জম্মু ও কাশ্মীর একটি বিশেষ 'অটোনমাস' মর্যাদা পেল। এই 'অটোনমাস' মর্যাদার ফলে জম্মু ও কাশ্মীর স্বশাসন ও পৃথক সংবিধান পেল এবং ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবরের চুক্তি অনুযায়ী এই রাজ্যের উপর ভারতীয় সংসদের আইন প্রয়োগের ক্ষমতা সীমিত করে দেওয়া হলো। এই বিশেষ সাংবিধানিক ব্যবস্থা ২০১৯ সালের ৫ আগস্টের পর বাতিল হয়ে যায়।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সংবিধানের ৩৭০ ধারা আইন ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁর এই বিরোধিতার মূল শেকড় এই বিশ্বাসে প্রোথিত ছিল যে, ঐক্যবদ্ধ ভারতের এক সংবিধান প্রয়োজন। জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা ভারতের জাতীয় সংহতিকে ব্যাহত করবে এবং তা জম্মু-কাশ্মীরকে ভারত থেকে আলাদা করার লক্ষ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে মদত জোগাবে। ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের এই দৃঢ় বিশ্বাস পরবর্তী পর্যায়ে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারা আইনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন ভারতকেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি জওহরলাল নেহরু মন্ত্রীসভার শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী ছিলেন। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণের বিষয়ে নেহরুর সঙ্গে মতপার্থক্য হওয়ায় তিনি ১৯৫০ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করলেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫১ সালে তিনি 'ভারতীয় জনসঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করলেন। তখন ভারত সরকার ও শেখ আবদুল্লার মধ্যে হওয়া 'দিল্লি চুক্তি' অনুযায়ী প্রণীত সংবিধানের ৩৭০ ধারা অনুসারে, জম্মু-কাশ্মীরকে এক অদ্বিতীয় মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল। এই চুক্তি অনুযায়ী জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য নিজস্ব সংবিধান, নিজস্ব পতাকা এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরিবর্তে 'প্রধানমন্ত্রী'র মর্যাদা পেয়েছিল, তদুপরি কাশ্মীরে ঢোকার জন্য 'পারমিট প্রথা' চালু করা হয়েছিল। ডক্টর মুখোপাধ্যায় এইসব বিষয়েরই প্রচণ্ড বিরোধিতা করে দেশে 'এক নিশান, এক বিধান, এক প্রধান'-এর দাবিতে অনড় রইলেন তিনি।

হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ জম্মুর অধিবাসীরা এসবের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুললেন জম্মু ও কাশ্মীর প্রজা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে। কারণ ৩৭০ ধারার ফলে জম্মুর হিন্দুরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। ডক্টর মুখোপাধ্যায় ও ভারতীয় জনসঙ্ঘ এই আন্দোলনকে সমর্থন করলেন। জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করে এই ধারার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি একই দেশে দুই বিধান এবং দুই নিশান চলবে না— চলবে না। স্লোগানটি চালু করেছিলেন। এই স্লোগান জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের আলাদা মর্যাদাকে সরাসরি আঘাত করল।

এই ধারার বিরুদ্ধে ১৯৫৩ সালে ডক্টর মুখোপাধ্যায় জনসঙ্ঘ, হিন্দু মহাসভা ও রাম রাজ্য পরিষদকে নিয়ে সত্যাগ্রহ শুরু করলেন। পণ্ডিত প্রেমনাথ ডোগরার নেতৃত্বে জম্মু ও কাশ্মীর প্রজা পরিষদ ডক্টর মুখোপাধ্যায়কে সমর্থন জানালেন। এই সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য ছিল জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা তুলে দিয়ে এই রাজ্যকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করা। পারমিট প্রথাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য তিনি বিনা 'পারমিটে' জম্মু যাওয়া স্থির করলেন। কারণ হিসেবে তিনি যুক্তি দিলেন যে, ভারতীয় নাগরিক ও সংসদের সদস্য হওয়ার সুবাদে তাঁর মৌলিক অধিকার রয়েছে মুক্তভাবে সারা ভারতে তিনি যেতে পারেন।

তিনি ১৯৫৩ সালের ৮ মে দিল্লি স্টেশন থেকে জম্মুর উদ্দেশে রওনা হলেন এবং ১১ মে পাঠানকোট হয়ে বিনা 'পারমিট'-এ জম্মুতে প্রবেশ করলেন। তাকে জম্মুতে ঢোকা মাত্র জন-নিরাপত্তা আইনের অজুহাত দেখিয়ে বন্দি করা হলো। যদিও পরে প্রমাণিত হয়েছিল যে পারমিট ছাড়া প্রবেশের জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। কারণ ভারত সরকার তাঁকে 'পারমিট' দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে শেখ আবদুল্লা ও নেহরু তাঁকে ভয় পেয়েছিলেন। শ্যামাপ্রসাদের অপরাধ ছিল যে, তিনি জম্মু ও কাশ্মীরবাসীর প্রকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তব অবস্থা জানতে চেয়েছিলেন। তিনি এও ভেবেছিলেন যে, তাঁদের নিয়েই আন্দোলন শুরু করবেন। পরদিন সকালে তাঁকে শ্রীনগর অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হলো। কথা ছিল তাঁকে শ্রীনগর সেন্ট্রাল জেলে রাখার, কিন্তু শ্রীনগরের জেল সুপারিনটেন্ডেন্ট শ্রীকান্ত সপ্রু তাঁকে শ্রীনগর থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে নির্জন পাহাড়ের উপরে নিশাতবাগের অপরিসর কটেজে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতি হতে থাকে। ২২ জুন ডক্টর মুখোপাধ্যায়কে শ্রীনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়, কিন্তু চিকিৎসায় চরম অবহেলার কারণে তাঁর স্বাস্থ্যের আরও ক্রমাবনতি হয়; পরদিন তিনি রাত্রি তিনটা চল্লিশ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই সারা ভারত শোকে আচ্ছন্ন হয়। তাঁর মা যোগমায়া দেবী জওহরলাল নেহেরুকে চিঠি লিখে তাঁর পুত্রের মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করলেন। কারণ তখন এ সংবাদটি ছড়িয়ে পড়েছিল যে তাঁর পুত্রের মৃত্যু চিকিৎসার অবহেলায় হয়েছে। পরবর্তীতে জানা যায় যে নেহরু যোগমায়া দেবীর চিঠির কোনো প্রত্যুত্তর দেননি এবং নিরপেক্ষ তদন্তও করেননি। কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা তুলে দেওয়ার জন্য শ্যামাপ্রসাদ তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন এবং তাঁর এই আত্মবলিদানের জন্য আজও তিনি ভারতবাসীর কাছে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চিন্তাধারা পরবর্তীকালে বাস্তবায়িত হয়েছে; যে ৩৭০ নং ধারা জম্মু ও কাশ্মীরে বলবৎ ছিল তা তাঁরই আদর্শে পরিচালিত ভারত সরকার ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট ভারতীয় সংবিধান থেকে বাতিল করে দিয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরকে সংবিধানের একই কাঠামোর মধ্যে আনার বিষয়ে ভারতকেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে আন্দোলন ও অদম্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেজন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন তা আপামর ভারতবাসীর কাছে স্মরণীয় ও প্রণম্য।

(লেখক রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত জাতীয়-শিক্ষক)

LAUREL

FINANCIAL SOLUTIONS

Laurel Securities Private Limited

(Member of National Stock Exchange of India Ltd.)

(Stock Broker and Portfolio Manager Service)

LAURELMF FINMART PRIVATE LIMITED

(Member of Association of Mutual Funds in India)

MUTUAL FUND DISTRIBUTOR

JAIN BAID & CO.

(Chartered Accountants)

909-910, Diamond Heritage, 16, Strand Road, 9th Floor, Kolkata - 700001

Phone No. 66153334-39, Fax No. 66153341 Email ID - prakash_laurel@yahoo.com

With Best Compliments from-

THE JOREHAUT GROUP LIMITED JOREHAUT 1859

THE JOREHAUT GROUP LIMITED

Gardens :

Borsapori, Numalighur, Langharjan & Rungagora 'J'

THE JOREHAUT AGRO LIMITED

Bhadra Tea Factory

AGRI IMPORT & EXPORT LIMITED

Office : 26, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 017, India

Phone : 2287-9388, 2290-4427, Fax : (033) 2281-0199

E-mail : jorehaut@jorehaut.com, Website : www.jorehaut.com

Producers & Exporters of Quality Teas Worldwide

ভারতীয় রাজনীতিতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সরোজ চক্রবর্তী

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী, বহুমুখী এবং প্রভাবশালী। তিনি একাধারে ছিলেন একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ, স্বাধীন ভারতের প্রথম জাতীয় মন্ত্রীসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং ভারতীয় রাষ্ট্রবাদী রাজনীতির অন্যতম প্রধান স্থপতি। ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা, জম্মু-কাশ্মীরের পূর্ণাঙ্গ ভারতভুক্তি এবং বিকল্প রাজনৈতিক ধারা নির্মাণে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বাঙ্গলার রাজনীতি এবং রাষ্ট্রবাদী সংগঠন অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙ্গলার উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি হিন্দু স্বার্থের প্রধান প্রবক্তা হিসেবে আবির্ভূত হন।

১৯২৯ সালে তিনি কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে প্রথম বঙ্গীয় আইন পরিষদে (Bengal Legislative Council) নির্বাচিত হন কিন্তু পরে আদর্শগত কারণে পদত্যাগ করেন।

মাত্র ৩৩ বছর বয়সে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য (Vice-chancellor) মনোনীত হন এবং শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৪১ সালে বঙ্গপ্রদেশে প্রগতিশীল কোয়ালিশন সরকার বা 'শ্যামা-হক' মন্ত্রীসভা গঠিত হলে তিনি বাঙ্গলার অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই মন্ত্রীসভায় থেকে তিনি বাঙ্গলার রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষায় ব্রতী হন। এটি ছিল বাঙ্গলার হিন্দু ও মুসলমান নেতৃত্বের এক ঐতিহাসিক সমন্বয়। তবে ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ সরকারের দমনমূলক নীতি ও মেদিনীপুরে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে আন্দোলনকারীদের উপর প্রবল অত্যাচারের

প্রতিবাদে তিনি মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

এর আগে ১৯৩৯ সালে তিনি হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন এবং পরবর্তীতে এই দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হন। মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেসের 'তুষ্টীকরণ' নীতির সমালোচনা করে তিনি হিন্দুদের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন গড়ে তোলেন।

মুসলিম লিগের পাকিস্তান দাবি এবং বাঙ্গলায় লিগের রাজনৈতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে তিনি হিন্দু মহাসভাকে একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে তোলেন।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর ১৯৪৩ সালের মহা দুর্ভিক্ষের সময় হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে ব্যাপক ত্রাণ কার্য চালানো হয়। যার অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় তিনি বাঙ্গলার মানুষের পাশে দাঁড়ান।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গঠিত 'বেঙ্গল রিলিফ কমিটি' এবং হিন্দু মহাসভার যৌথ প্রচেষ্টায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে অন্য ও বস্ত্র পৌঁছে দেওয়া হয়।

১৯৪৩ সালের পর বাঙ্গলার প্রিমিয়ার খাজা নাজিমুদ্দিন ও পরবর্তী প্রিমিয়ার হোসেন শহিদ সুরাবর্দির নেতৃত্বে মুসলিম লিগ সরকার গঠিত হলে মুসলিম লিগের ভয়াবহ শাসনের প্রেক্ষিতে তীব্র বিরোধী ভূমিকা নেন শ্যামাপ্রসাদ।

'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' বা ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট কলকাতা এবং নোয়াখালিতে ভয়াবহ দাঙ্গার পর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, মুসলিম লিগ শাসিত বাঙ্গলায় হিন্দুরা নিরাপদ নয়। হিন্দু নরসংহার শুরু হওয়ার পর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হোসেন সুরাবর্দির পুলিশ-প্রশাসন যখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ বা নিষ্ক্রিয় ছিল, তখন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হিন্দুদের রক্ষার জন্য সক্রিয় ভূমিকা নেন। তাঁর নির্দেশে মহাজাতি সদন এবং অন্যান্য জায়গায় হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে উদ্ধার কার্য ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়। পাশাপাশি তিনি হিন্দুদের আত্মরক্ষার্থে সংগঠিত হওয়ার ডাক দেন।

১৯৪৭ সালে যখন ভারতের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয় তখন মুসলিম লিগ পুরো বাঙ্গলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানায়।

শরৎচন্দ্র বসু ও হোসেন সুরাবর্দির স্বাধীন অখণ্ড বঙ্গ (United Bengal) গঠনের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন শ্যামাপ্রসাদ। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, এরপরে পুরো বাঙ্গলাই কার্যত পাকিস্তানের অংশ হয়ে যাবে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দাবি তোলেন— 'ভারত ভাগ হলে বাঙ্গলাকেও ভাগ করতে হবে এবং হিন্দুদের জন্য আলাদা

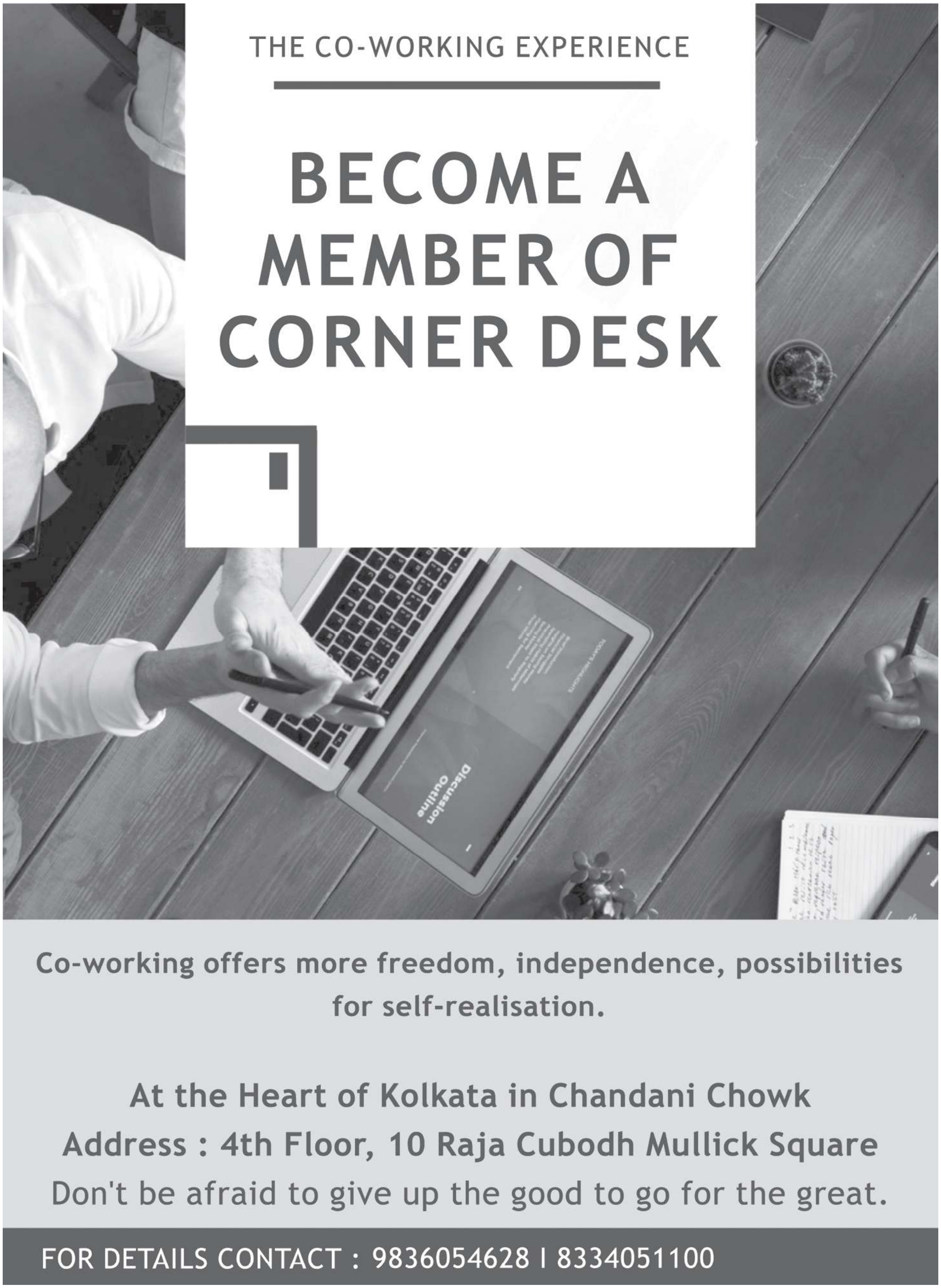
THE CO-WORKING EXPERIENCE
BECOME A MEMBER OF CORNER DESK
Discussion Outline
Co-working offers more freedom, independence, possibilities for self-realisation.
At the Heart of Kolkata in Chandani Chowk
Address : 4th Floor, 10 Raja Cubodh Mullick Square
Don't be afraid to give up the good to go for the great.
FOR DETAILS CONTACT : 9836054628 I 8334051100

রাজ্য দিতে হবে।' তাঁর এই অনমনীয় আন্দোলনের ফলেই ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় আইনসভায় বাঙ্গলা ভাগ অনুমোদিত হয় এবং আজকের 'পশ্চিমবঙ্গ' ভারতের অংশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তাই ২০ জুন দিনটিকে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাঙ্গলার রাজনীতিতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা আজও অত্যন্ত চর্চিত। সমালোচকদের মতে, তাঁর রাজনীতি বাঙ্গলার সম্প্রদায়িক মেরুকরণ বাড়িয়েছিল। অন্যদিকে সমর্থকদের মতে, ড. শ্যামাপ্রসাদের দূরদর্শিতার কারণেই আজ বাঙ্গালি হিন্দুরা নিজস্ব একটি রাজ্য 'পশ্চিমবঙ্গ'কে নিজেদের 'হোমল্যান্ড' হিসেবে পেয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর আমন্ত্রণে তিনি দেশের প্রথম সর্বদলীয় জাতীয় মন্ত্রীসভায় 'শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী' হিসেবে যোগ দেন। ভারতের প্রথম শিল্পনীতি প্রস্তাব (Industrial Policy Resolution, 1948) তাঁর হাত ধরেই তৈরি হয়, যা চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ এবং সিন্ধ্রি সার কারখানার মতো আধুনিক ভারতে প্রথম সারির বৃহৎ শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করে।

১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের উপর হওয়া নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং 'নেহরু-লিয়াকত চুক্তি'র বিরোধিতা করে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এটি ছিল ভারতীয় রাজনীতিতে নৈতিকতার এক বিরল দৃষ্টান্ত।

বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহযোগিতায় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৫১ সালের ২১ অক্টোবর 'ভারতীয় জনসঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। এই দলই পরবর্তীতে পুনর্গঠনের মাধ্যমে ভারতীয় জনতা পার্টিতে রূপান্তরিত হয়।

১৯৫২ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে তিনি বিরোধী দলগুলোকে একত্রিত করেন এবং 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক হাউস' গঠন করেন। সংসদে তাঁর ক্ষুরধার ও গঠনমূলক সমালোচনা সমকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে এক 'আদর্শ বিরোধী নেতা'র দৃষ্টান্ত তৈরি করেছিল। জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য ভারতীয় সংবিধান-প্রদত্ত বিশেষ মর্যাদা ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং সেখানে প্রবেশের জন্য আলাদা পারমিট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। 'এক দেশে দুই প্রধান, দুই বিধান, দুই নিশান চলবে না।' তাঁর এই স্লোগান ভারতীয় রাজনীতিতে জাতীয় সংহতির প্রতীক হয়ে ওঠে। ১৯৫৩ সালের মে মাসে পারমিট ছাড়াই কাশ্মীরে প্রবেশ করায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯৫৩ সালের ২৩ জুন বন্দি অবস্থায় চিকিৎসাধীন থাকাকালীন রহস্যজনকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মা যোগমায়া দেবী এবং সমসাময়িক বহু রাজনৈতিক নেতা এই মৃত্যুর পিছনে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তৎকালীন নেহরু সরকার কোনও তদন্ত কমিটি গঠন করেনি। তাঁর মৃত্যুর রহস্য আজও ভারতীয় রাজনীতির একটি বড়ো বিতর্ক হয়ে রয়েছে।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন যে, একটি শক্তিশালী বিরোধীদল ছাড়া গণতন্ত্র পূর্ণতা পায় না। সংসদে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করার এক অনন্য নজির তিনি স্থাপন করেছিলেন।

ভারতের রাজনীতিতে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধ ও 'অখণ্ড ভারত'— এই ধারণাকে রাজনৈতিক এজেন্ডা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার মূল কৃতিত্ব তাঁরই। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রাজনৈতিক আদর্শ এবং বিশেষ করে জম্মু-কাশ্মীরের পূর্ণ ভারতভুক্তির স্বপ্নই বর্তমান ভারতের শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টির রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি।

কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৫১ সালের ২১ অক্টোবর ভারতীয় জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এই ভারতীয় জনসঙ্ঘ পরবর্তী পর্যায়ে পুনর্গঠিত হয়ে আজকের 'ভারতীয় জনতা পার্টি' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ড. মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই রাজনৈতিক ঘরানার প্রথম প্রধান জাতীয় নেতা।

১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ভারতীয় জনসঙ্ঘ তিনটি লোকসভা আসন জিতলেও সংসদে নিজের অসাধারণ বাগ্মিতার জোরে একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি পান ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগ এবং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাজনীতি, সংসদীয় গণতন্ত্র ও আধুনিক জাতীয়তাবোধের ভিত্তি গঠনে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। তিনি কেবল স্বাধীন ভারতের প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন না, বরং ভারতের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক ধারারও ছিলেন স্থপতি। তিনি ছিলেন একাধারে দক্ষ শিক্ষাবিদ, দূরদর্শী জননেতা এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম শক্তিশালী বিরোধী কণ্ঠস্বর। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান এক অনন্য অধ্যায়।

তথ্যসূত্র: ১. Syama Prasad Mookerjee : Life and Times— Tathagata Roy. ২. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ডায়েরি ও স্মৃতিকথা ৩. Portrait of a Martyr : A Biography of Dr. Syama Prasad Mookerjee— Prof. Bal Raj Madhok. ৪. The Great Calcutta Killings and Noakhali Riots— A Historical Review. ৫. Constituent Assembly Debates (1946-1950)

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

** *বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

With Best Compliments From :-

EAST INDIA TRANSPORT AGENCY

(A Unit of E.I.T.A. India Limited)

20B, Abdul Hamid Street
4th Foor
Kolkata - 700 069
Phone : Nos. 22483203
Fax No. 22483195
Email : eita.cal@eitain.com

With Best Compliments From :

ALLIANCE MILLS (LESSEES) LTD.

18, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001
Phone : 2243-6401 / 02

Quality manufacturers and leading exporters of hessian cloth and bags, sacking cloth and bags and twine

E-mail : alliance@cal12.vsnl.net.in
Fax : 91-33-22202260
GRAM : ALJUTLES

MILLS

Alliance Jute Mills

Jagatdal 24 Paraganas

Phone : 2581-2745 / 2746 (Bhatpara)